



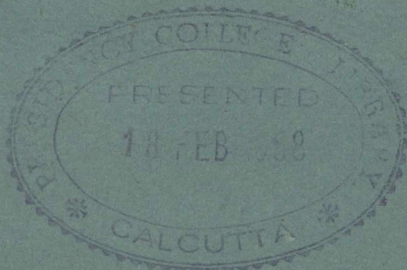
093.7
D.926

0937

P. 926

29

প্রিন্সিপাল কলেজ
পত্রিকা



১৩৬৪

CONTENTS

	<i>Page</i>
কলেজ প্রসংগ	১
সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ	৪
বিজ্ঞানের দর্শন	১৬
শেষের কবিতা	২১
একটি সুখী পরিবার	২৭
গাণিতিক	৩৩
জীবনটা এমনিই	৪১
হৃদয়ের মৃত্যু	৪৫
দুটি কবিতা	৪৬
—ব ডায়েবী থেকে	• ৪৭
আশ্বিনের মাঠে	৪৮
দুটি কবিতা	৪৯
আমাদের কথা	৫১
EDITORIAL	1
CHESTERTON THE ECCENTRIC	3
TO WIT AND TO WOO MR THURBIFR'S WONDER-WORLD	5
THE VICTORIAN TEMPER	9
WHITHER COMMUNISM	13
A CRITICAL NOTE ON MARXISM	24
AN EMINENT VICTORIAN	28
A HOMILY ON NEIGHBOURS	30
D. V. PALUSKAR	33
BOOK REVIEW	36

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য্য (সভাপতি)

” শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীঅশোকসঞ্জয় গুহ (সম্পাদক)

শ্রীদেবকীনন্দন মণ্ডল (কর্ম-সচিব)

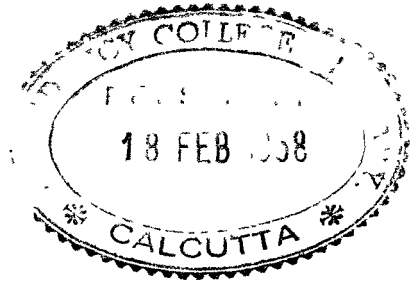
ছবির ব্লক করেছেন শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



শিল্পী বন্দনা বায়।
৬ষ্ঠ বর্ষ কলা।



ফটো : প্রশান্ত রায়চৌধুরী।
চতুর্থ বর্ষ : বিজ্ঞান।



প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ :: উনত্রিশৎ বর্ষ :: ডিসেম্বর, ১৯৫৭।

কলেজ প্রসঙ্গ

পত্রিকার কথা।

চিরাচরিত প্রথা অনুসারেই প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার সম্পাদক প্রতি সংখ্যায় অন্তত দুবার করে অসতর্ক পাঠককে আক্রমণ করার স্বযোগ পেয়ে থাকেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ প্রাচীনপন্থী। তাই এবারও আপনাদের এই সম্পাদকীয় অনাচারটুকুকে ললাট-লিখন বলেই মেনে নিতে হল।

এতে প্রগতিবাদীরা ক্ষুব্ধ হলেও, পুরাতনপন্থীরা সন্তুষ্ট হবেন কি না সন্দেহ। বিশেষ করে বর্তমান সংখ্যার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটুকু এঁদের দৃষ্টি এড়াবে না নিশ্চয়। অর্থাভাবের অতি-পুরাতন অছিলায় বর্তমান সংখ্যার আকারের নিদারুণ সঙ্কোচন এঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। এটা সম্পাদনায় সভারই এক দুশ্চেষ্টার পরিণাম; এ বৎসরে ছুটি সংখ্যা প্রকাশ করার দুঃসংকল্প ত্যাগ করতে আমরা অসমর্থ। আশা করা যাক, রসগ্রাহী পাঠক নিজগুণে সম্পাদকের এই ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করবেন।

এর পরেই আপনার চোখে পড়বে আমাদের বাংলা বিভাগের রচনার দৈন্ত। অধ্যাপকেরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপযুক্ত সাড়া পাওয়ার আশা করে এবার লেখনীচালনে বিরত ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে কলেজের লেখকগোষ্ঠী তাঁদের এই আশা সার্থক করে তুলতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। বিশেষ করে, আমাদের হাঙ্গরসিকরা যেন কলম ধরতে অধিকতর কুষ্ঠা বোধ করেন। এই জন্তই হবত প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা তার অটল গান্ধীব্যের ঐতিহ্যে এখনও অচলপ্রতিষ্ঠ। এ বিষয়ে আমাদের অদৃষ্টবাদী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কলেজ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অবশ্য সচরাচর স্ববুদ্ধির আশঙ্কা করা যায় না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে সম্পাদকের কর্তব্যের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। নির্বাচনের ব্যাপারেই সম্পাদকীয় নিবুদ্ভিতার সূচনা ও সমাপ্তি। তাই কলেজ পত্রিকার উন্নতিসাধনে বন্ধপরিষ্কার হয়ে যদি লেখনীধারণ করেন, তাহলে আপনার সফলকাম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পাদকের সকল চক্রান্ত বিফল করে দিয়ে পরবর্তী সংখ্যার উৎকর্ষ সাধন করার জন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ তাই আপনারই মুখাপেক্ষী।

পরীক্ষার ফলাফল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যে কৃতিত্বের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, এবারও তা কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নি। আই এ ও আই এম-সি পরীক্ষায় আমাদের পাশের হার যথাক্রমে শতকরা ৯৮.৭ ও ৯৯। আই এম-সিতে এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আমাদের ছাত্র শ্রীমথুরেশ পোদ্দার, এবং প্রথম দশ জনের মধ্যে সাত জনই ছিলেন আমাদের ছাত্র।

এবার বি এ ও বি এস-সি পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে ৮৭.১ ও ৭৭.৪৫। বি এ পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন সাতজন, ও বি এস-সিতে চব্বিশ জন। পদার্থ-বিজ্ঞান, ভূগোল, ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান, সংখ্যাবিজ্ঞান, গণিত (কলা), ইতিহাস ও অর্থনীতিতে আমাদের ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরেজী ও বাংলায় এ বছর প্রথম শ্রেণীতে কেউ স্থান পায় নি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আমাদেরই দুজন ছাত্রী। বি এ পরীক্ষার সর্বোচ্চ সম্মান ক্রেশানবৃত্তি লাভ করেন অক্ষ বিভাগের ছাত্র শ্রীশীতাংশুশেখর মিত্র।

কলেজে পরিবর্তন।

গত সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনীতি বিভাগের শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ উচ্চতর গবেষণার্থে বিদেশ যাত্রা করতে আমরা এক প্রিয় অধ্যাপকের সংস্পর্শ হারিয়েছি। কেবল মাত্র পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের ভারে নয়, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও প্রকৃতিগত সরলতায়ও ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। এঁর স্থান পূর্ণ করেছেন কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার। শ্রীপ্রভাকর সেন গেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে বদলী হয়েছেন। এঁর পরিবর্তে যোগদান করেছেন শ্রীতাপস মজুমদার। ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাসত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়েছেন; পাঠ্য তালিকার অন্তর্গত ও বহির্ভূত বিবিধ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সমাজের সঙ্গে এঁর যে নিবিড় সংযোগ ছিল তা বিচ্ছিন্ন হল। এ বিভাগে শ্রীনীতিশচন্দ্র সেনগুপ্তের স্থানে যোগদান করেছেন

শ্রীমধীরকুমার পাল। বাংলা বিভাগ শ্রীকালীপদ সেনকে হারিয়েছে। ইংরেজী ও গণিত বিভাগে যোগ দিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীকরণাশঙ্কর রায় ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বহু।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বোষাল উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ম বিদেশ যাত্রা করেছেন। জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীসরোজবন্ধু সাত্তাল ও শ্রীশান্তমুকুমার মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেছেন; এঁদের পরিবর্তে এসেছেন শ্রীপরেশকিশোর সেনচৌধুরী ও শ্রীহরিপদ রায়। রসায়ন বিভাগে শ্রীঅজয়কুমার রায়চৌধুরী যোগদান করেছেন শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়ের পরিবর্তে। শ্রীরথীন্দ্রনাথ বসুরায়চৌধুরী উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ম বিলেত যাত্রা করেছেন। শ্রীনলিনী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্তর্ভুক্ত চলে গেছেন। ভূবিজ্ঞান বিভাগে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত অবসর গ্রহণ করেছেন; এ বিভাগে নবাগত শ্রীতিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী। ভূগোল বিভাগে শ্রীপুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে এসেছেন শ্রীসত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তী। উদ্ভিদবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেছেন যথাক্রমে শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত ও শ্রীদুর্জয়ী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে প্রেসিডেন্সি কলেজে যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক নিযুক্ত করার ব্যাপারে সরকার অতীব উদাসীন। অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি বিভাগের দুর্গতির সাময়িক অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু ইতিহাস ও বাংলা বিভাগের অবস্থা এখন সঙ্গীন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদেরই শুধু নেওয়া হয় বলে যে পড়ানোর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই, এই ধারণাটি যেন সরকার শীঘ্রই ত্যাগ করেন।

শোক সংবাদ।

গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ তার দুজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রকে হারিয়েছে। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় দুজনেই ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী। ছাত্রাবস্থার অবসানের সঙ্গেই প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে তাঁদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয় নি। শ্রীসেন ইতিহাসের, ও শ্রীমুখোপাধ্যায় দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে সে যুগের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে সক্ষম হন। শ্রীমুখোপাধ্যায় পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য ও রেজিষ্ট্রার হিসাবেও বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। আমরা এঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

২

আমি বরাবর টেকসই বৃক্কের সমস্তটার উপর প্রশ্ন লিখিয়া দিতাম ; কোন শ্লোক বাদ দিতাম না—কোন শ্লোকটির সংস্কৃত টীকা লিখিয়া দিতাম, কোনটির বা ইংরেজি অনুবাদ করিতে দিতাম । কোনটির বা বাচ্য পরিবর্তন করিতে দিতাম, কোনটির বা মর্মার্থ লিখিতে দিতাম । ফলতঃ আমার প্রশ্নগুলির মধ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই প্রায়ই পড়িত । এজ্ঞা খুব মনোবোগের সহিত ছাত্রেরা আমার প্রশ্নগুলি শুনিত ও লিখিয়া লইত । একদিন এমন সময় গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব ও এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ব্রজবাবু পশ্চাতে আসিয়া যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই ; ছেলেরাও সাহেবকে দেখিয়াও চঞ্চল হয় নাই ; নীরব ভাবে প্রশ্নগুলি লিখিয়া লইতেছিল । সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন । পরে ব্রজবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন—“হরিশ ! তুমি কি পড়াইতেছিলে ? সাহেব তোমার ক্লাস দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে, তিনি হুগলি কলেজে সংস্কৃত পড়াইবার সময় বড় গোল হয় দেখিয়াছেন ; কিন্তু এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন । যাহা হউক, সাহেব তোমাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন । তুমি গিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা কর ।” আমি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম । তিনি আমাকে আদর করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিলেন, এবং ক্লাসে আমার শান্তিরক্ষার খুব প্রশংসা করিলেন । আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম ।

নিম্নে একটি ঘটনা লিখিলাম । ইহা পাঠ করিয়া পাঠক বিচার করিয়া বলিবেন—আমি দোষী কি নির্দোষ । পূর্বের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সংকলিত ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ নামক পুস্তকখানি প্রায় ১৬ বৎসরের অধিককাল প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইয়া চলিয়া আসিতেছিল । ঐ সময় মৎ-সংকলিত সংস্কৃত পাঠ প্রথম ভাগ নামক পুস্তকখানি অনেক স্কুলের পাঠ্যরূপে নিদিষ্ট হওয়ায় আমি উহার ২য় ভাগ সংকলিত করি । ঐ শেখোক্ত পুস্তকে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ হইতে গণ্ড অংশ সংগৃহীত করিয়া এবং মহাভারত হইতে বক রাক্ষস বধ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান পঞ্চ অংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম । এবং মোহমুদগর, নীতিনিচয় প্রভৃতি নানা নীতিসূচক শ্লোকও দিয়াছিলাম । আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের অমুমতি লইয়া আমি ঐ ২য় ভাগ সংস্কৃত পাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইবার উদ্দেশে সিণ্ডিকেটে পেশ করিয়াছিলাম । বইখানির সঙ্গে কে. এম্ ব্যানার্জি, টনি

সাহেব, গাফ্ সাহেব, হার্গলি সাহেব—এই ৪ জনের অভিমতগুলিও পাঠাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ঐ বই খানিতে খুব ভাল অভিমত দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ বোর্ড অফ্ সানস্ক্রিপ্ট স্টাডিস্ ঐ বইখানি পছন্দ করিলেন না। তৎকালে ঐ বোর্ডে কে. এম. ব্যানার্জি মহাশয়, মহেশ্চন্দ্র ঞায়রত্ন মহাশয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি কয়েকজন সভ্য ছিলেন। প্রথমোক্ত ৪ জন মেম্বার আমার পুস্তক মনোনীত করিলেন না। তাঁহারা সিণ্ডিকেটের উপর ভার দিলেন। তৎকালে সার্ব্ এল্ফ্রেড ক্রফ্‌ট্ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের প্রধান মেম্বার ছিলেন। টনি সাহেব রেজিস্ট্রার ছিলেন; এবং ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, ছিলেন। আমি শেষোক্ত ব্যক্তির মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। টনি সাহেব যখন ঐ সংস্কৃত পাঠ ২য় ভাগখানি ও তৎসম্পৃক্ত মতগুলি ও বোর্ডের মতটি ক্রফ্‌ট্ সাহেবের হাতে দেন তখন এই বলিয়া দিয়াছিলেন,—“The opinion of an European is ten times more valuable than the opinion of a native।” ক্রফ্‌ট্ সাহেব যেমন দেখিলেন যে সকল সাহেবই ঐ পুস্তকে ভাল মত দিয়াছেন তখন ‘oh yes’ এই বলিয়া সংস্কৃত পাঠ ২য় ভাগখানিকে ১ বৎসরের জন্ম পাঠ্য করিয়া দিলেন। সিণ্ডিকেটে কোনরূপ বিচার উঠে নাই; নির্বিঘ্নে আমার বই মনোনীত হইল। ইহাতে ঞায়রত্ন মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। এবং তাঁহাদের মত অগ্রাহ হইল দেখিয়া এবং প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিয়া কৃতকার্য হইলাম দেখিয়া কিছুকাল পরে আমি ‘রূপকরত্নম্’ নামে একখানি ফার্সূট্ আর্ট্‌স্ পাঠ্য সংগৃহীত করিলাম। উহাতে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, বেণী সংহার প্রভৃতি নাটক হইতে সন্দর্ভ সকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। উহাতে স্ত্রীলোকের বর্ণনা ছিল না; বীররস ও শাস্তিরসের বর্ণনা ছিল। বইখানি সিণ্ডিকেটের সভায় পেশ করিবার পর পূর্ববৎ ঞায়রত্ন মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ মহাশয়—এই তিনজন মত দিলেন না। কিন্তু আমার দৌভাগ্য বশতঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সারদা মিত্র জজ মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক মহাশয় এবং আর একজন হাইকোর্টের উকীল, নাম গোলাপ শাস্ত্রী সরকার এম-এ এই চার জনে মত দিলেন; বিশেষতঃ বঙ্কিম-বাবু আমার পুস্তকের জন্ম খুব লড়াই করিয়াছিলেন। একথা আমি ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। ত্রৈলোক্যবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বঙ্কিমবাবু তোকে এত ভালবাসে কেন?” আমি বলিয়াছিলাম, “বঙ্কিমবাবুর প্রথম তিনখানি পুস্তক অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ আমাদের ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছিল। সেই স্মৃত্ত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। এতদিন তাঁহার দুইটি দৌহিত্র আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র।” এইরূপে ‘রূপকরত্নম্’ এক বৎসরের পাঠ্য হওয়াতে ঞায়রত্ন মহাশয় আরও বিরক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করিয়া লইলেন, যে, এখন হইতে কোন বাহিরের লোককে কোন পাঠ্য পুস্তক করিতে দেওয়া হইবে না; বোর্ডের মেম্বারগণ আপনারা পুস্তক

প্রস্তুত করিবেন। তদনুসারে মহেশচন্দ্র শ্রায়রত্ন মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়, এই তিন জনে একত্র হইয়া একখানি প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিলেন। ঐ পুস্তকের পাদটীকা তাঁহারা সংস্কৃত লিখিয়াছিলেন। ঐ পাদটীকা সকলে দুই-চারিটি সংস্কৃত ব্যাকরণ ভুল হইয়াছিল। আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্-এ এবং বঙ্গবাসী কলেজের হেড পণ্ডিত শ্রীমান্ চন্দ্রোদয় বিত্তাবিনোদ এই দুই জনে “হিতবাদী” সংবাদপত্রের ওটা সংখ্যায় ঐ ভুলগুলি ছাপাইয়া দেন, এবং শ্রায়রত্ন, নীলমণি ও কৃষ্ণকমল এই তিনটি নামের উপর রসিকতা করিয়া বেশ দুই চারিটি তামাসা করিয়াছিলেন। এ-সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, এবং এক কলমও লিখি নাই। হিতবাদী কাগজের ছাপা পাঠ করিয়া শ্রায়রত্ন মহাশয় সার্ব আল্ফ্রেড ক্রফ্ট ডিরেক্টর মহাশয়ের নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন যে কলিকাতার মধ্যে হরিশ ছাড়া এমন কোন পণ্ডিত নাই যে আমাদের তিনজন কর্তৃক বিরচিত পুস্তকের দোষ ধরে। এসব কার্য হরিশের নিশ্চয়। শ্রায়রত্ন মহাশয় আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, তুমি এইগুলি লিখিয়াছ কিনা। যদি জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে আমি প্রমাণ করিয়া দিতাম, যে আমি উহা লিখি নাই। তিনি আমার নামে ঐরূপ দোষারোপ করিতেছেন শুনিয়া আমি শপথ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, আমি উহার কিছুই করি নাই। তিনি চন্দ্রোদয় বিত্তাবিনোদকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে রসগোল্লা খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“এ কার্য কে করিয়াছে, বল, হরিশ কি লিখিয়াছে?” চন্দ্রোদয় বলিয়াছিল—“মহাশয় ইহা আমিই করিয়াছি; হরিশবাবু কিছুই করেন নাই।” চন্দ্রোদয় আরও বলিয়াছিল, “শ্রায়রত্ন মহাশয় ভবী ভুলিবার নয়। অর্থাৎ আপনি যতই কেন রসগোল্লা খাওয়ান, আমি কলম ধরিতে ছাড়িব না।” এই কথা উক্ত পণ্ডিত আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল। পূর্বে দুইটি কার্যে শ্রায়রত্ন মহাশয় আমার উপর ঐরূপ কুপিত হইয়া রহিলেন যে, আমাকে কিরূপে বোরতর অপদস্থ করিবেন মনে মনে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকস্ট বুক সকলের উপর এক সেট প্রশ্ন খাতায় লিখিয়া রাখিতাম, এবং ঐগুলি সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদিগকে ডিক্টেট করিতাম। তাহার ঐ সকল প্রশ্ন লিখিয়া লইত। আমি প্রত্যেক শ্লোকের উপর প্রশ্ন করিতাম তাহা ইতিপূর্বে লিখিয়াছি। এক বৎসর নীলমণিকে ও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ফার্স্ট আর্টস সংস্কৃত পরীক্ষক করিল। নীলমণিকে সকালের পেপার ও আমাকে বৈকালের পেপার দিয়াছিল। তখন মডারেশন সিস্টেম ছিল। স্তত্রাং শ্রায়রত্ন, গুরুদাসবাবু ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আমাদের মডারেটর হইলেন। আমাদের প্রশ্ন তাঁহারা পৃথক সময়ে দেখিয়া দিলেন। অর্থাৎ অগ্রে নীলমণিকে ডাকিয়া তাহার প্রশ্ন দেখিলেন। তখন আমাকে সেস্থানে থাকিতে দিলেন না। এবং আমার প্রশ্ন যখন দেখেন, তখন নীলমণিকে তথায় থাকিতে দিলেন না। এইরূপ লুকোচুরির ভিতর যে একটা গৃহ রহস্য ছিল, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে

বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। গায়রত্ন মহাশয় আমার প্রশ্নের শ্লোকগুলি যেন গিলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একটি একটি শ্লোক ৩৪ বার আমাকে পড়িতে বলিলেন। কিন্তু আমার দত্ত প্রশ্নসকল যথাযথ মুখস্থ করিতে পারিলেন না। ঐ দিন তিনি নিজ বাটা গিয়া যে কয়েকটি শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন, সেইগুলি একটা কাগজে লিখিয়া এবং নিজের মনগড়া একসেট প্রশ্ন লিখিয়া (কারণ আমার দত্ত প্রশ্নগুলি তাহার ঠিক মনে ছিল না) শীলমোহর করিয়া ঐ কাগজখানি 'সঞ্জীবনীর' সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন, যেন এই কাগজে লিখিত বিষয়গুলি এখন ছাপা না হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সট আর্টস পরীক্ষা হইয়া গেলে যেন ছাপা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর যখন তিনি গায়রত্ন মহাশয় প্রদত্ত শীলমোহর করা প্রশ্নগুলি ছাপিলেন, তখন দেখিলেন যে, শ্লোকগুলির কোন মিল নাই কারণ, ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছি যে, তিনি আমার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দত্ত প্রশ্নগুলি মনে করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজের সঙ্গে তাহার দত্ত কাগজের ঠিক মিল হয় নাই। কিন্তু গায়রত্ন মহাশয় ক্রফট সাহেবের নিকট গিয়া বলিলেন যে হরিশ নিজের ছেলেদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছে। অতএব তাহার বিচার করা উচিত। বিচারে যদি দোষী প্রমাণীকৃত হয়, তবে তাহাকে ডিপার্টমেন্ট হইতে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে ক্রফট সাহেব, টনি সাহেব, গুরুদাসবাবু এবং এ. এম. বোস, এই ৪ জন বিচারক স্থিরীকৃত হইল; এবং একদিন রাত্রি ১০টার সময় রাইটার্স বিল্ডিং-এ হাজির হইতে আমার উপর হুকুম হইল। আমি ঐ নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। এবং গিয়া শুনলাম যে, ইতিপূর্বে ৮ জন ছাত্রকে তলব দিয়া আনা হইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল—পণ্ডিত মহাশয় আমাদের কিছুই বলেন নাই। তিনি পূর্ব পূর্ব বৎসর ছাত্রদিগকেও যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমাদেরকেও সেইসকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, বেশীকিছু দেন নাই। শুনলাম, বিচারকগণের একজন এক ছাত্রকে বলিয়াছিলেন, তোমাকে যদি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া দেওয়া হয়, তবে তুমি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের নামে কোন দোষ আছে কিনা, সত্য বলিতে পার কিনা? সে নাকি বলিয়াছিল—আপনি যদি আমাকে হাই কোর্টের জজ করিয়া দেন, তথাপি আমি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের কোন দোষ দিতে পারি না। শুনলাম, কেহ কেহ লিখিত খাতা আনিয়া প্রমাণ করিয়াছিল, যে "আমাদের পণ্ডিত মহাশয় নির্দোষ।" এইরূপ আমার অগোচরে আমার ৮ জন ছাত্রের সাক্ষ্য লইয়া বিচারকগণ বসিয়া ছিলেন, এমন সময় আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হই। এ-এম্ বোস আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যে-সকল প্রশ্ন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাশে ছাত্রদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন সেগুলি কই? আমি আমার খাতা লইয়া গিয়াছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই খানি এ. এম. বোসকে দিলাম, এবং বলিলাম যে আপনি দেখুন যে সংস্কৃত টেক্সট বুক বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই পুস্তকের ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি সকল শ্লোকেরই উপর প্রশ্ন দিয়াছি। একটি স্ট্যান্ডজাও ছাড়ি নাই। এ. এম. বোস দেখিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—হ্যাঁ, দেখিতেছি সকল শ্লোকের

উপর আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি বলিলাম—দেখুন, আমি ক্লাসে যেরূপ প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপত্রে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক প্রশ্ন দিয়াছি। দেখুন, ক্লাসে যে-শ্লোকে Explain in sanskrit প্রশ্ন দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে সে শ্লোকে Translate into English দিয়াছি। একরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দেখিবেন। এই সময় গুরুদাসবাবু বলিলেন—“still the stanza is the same.” ইহাতে এ. এম. বোস বলিয়া উঠিলেন, “গুরুদাস বাবু, আপনি জজ, বিচার করিয়া বলুন দেখি, হরিশবাবু যখন সকল স্ট্যানজার উপরই প্রশ্নাদি করছেন, তখন তিনি নূতন স্ট্যানজা কোথায পাইবেন? তিনি ত কালিদাস নন, যে নূতন স্ট্যানজা গড়িবেন। আর গড়িলেই বা আমরা সে স্ট্যানজা অহুমোদন করিব কেন? সেগুলি ত আমাদের নিদিষ্ট টেক্সট নহে। অতএব উহাকে একটা না একটা স্ট্যানজা উদ্ধৃত করিতেই হইবে। তবে আমাদের এই দেখা কর্তব্য যে উনি ক্লাশে যে সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, সেগুলির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে দত্ত প্রশ্নের একটিও মিলিয়াছে কিনা। যদি না মিলিয়া থাকে, তাঁহাকে আমরা দোষী করিতে পারি না। ইহাতে গুরুদাস বাবু আবার বলিলেন—“It was not fair on the part of Pandit Kaviratna to set questions on the text book.” ইহাতে এ. এম. বোস, টনি সাহেব ও ক্রফ্ট সাহেব সকলেই বলিয়া উঠিলেন—“He has done his duty as a Professor. A Professor must point out difficult and important passages to his students.” আমার মনে হয় ক্রফ্ট সাহেব বলিয়াছিলেন—“I did such things when I was a Professor in the Presidency College.” ইহাতে গুরুদাসবাবু আর কিছু বলিলেন না, নীরব হইয়া রহিলেন। ইহাতে ক্রফ্ট সাহেব নিজ টেবিলে একট দৃঢ় মুষ্টিঘাত করিয়া বলিলেন, “Haris is honourably acquitted.” ইহার পরে আমি সকলকে লম্বা সেলাম দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। এবং ঐ রাত্রি নির্বিঘ্নে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ক্যালকাটা গেজেটে দেখিলাম—আমি প্রভিন্সিয়াল গ্রেডে উন্নীত হইয়াছি ও ২০০ টাকা বেতন হইয়াছে। আমাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিস্টার স্ট্যাক সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন—“Haris dont fear, Sir Alfred Croft has told me that he has understood everything. When Haris can find out the mistakes of even Pandit Mohes Nyayaratna, he must be promoted.” আমি বুঝিলাম ভগবান, আমার প্রতি রূপা করিয়া ক্রফ্ট সাহেব দ্বারা আমার উন্নতি করিয়া দিলেন।

এস্থলে আমার বক্তব্য এই—শ্রায়বল্প মহাশয় যে আমার উপর জাতকোষ হইয়া আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে। সম্ভবতঃ তিনি কর্তব্য বোধেই এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি আমার নামে যেরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক মিস্টার হিল নামে একজন সাহেবের নামেও এরূপ অভিযোগ

করিয়াছিলেন। হিল সাহেব ডিরেকটর সাহেবের নিকট আসিয়া কিরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। আমি শুনিয়াছি মাত্র, সত্য মিথ্যা জানি না। ডিরেকটর সাহেব যখন বলেন, তুমি ছাত্রদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছ? তাহাতে হিল সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন—It is a happy coincidence. যাহা হউক গ্রায়রত্ন মহাশয় আমায় পূর্বে ভালবাসিতেন। এবং আমার অনেক বিপদ নিবারণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি আমাকে বলেন, হরিশ, তুমি তোমার ছাপাখানার কোন পুস্তকে তুমি প্রিন্টার বলিয়া ছাপিও না। তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট তোমাকে পেনসন দিবেন না। আমি ইহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। আর একবার যখন টনি সাহেব আমাকে ছোয়ার স্কুলে হেড পণ্ডিত করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তখন আমি চাকরি ত্যাগ করিব সম্বন্ধ করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া গ্রায়রত্ন মহাশয় ডিরেকটর সাহেবের নিকট গিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং আমায় কোথাও যাইতে হয় নাই। তখন আমি গ্রায়রত্ন মহাশয়কে আমার হিতৈষী বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। আর একবার যখন ডিরেকটর সাহেব আমাকে ঢাকায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন গ্রায়রত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডিরেকটর সাহেবকে এরূপ বলিয়াছিলেন যে, আমাকে ঢাকায় যাইতে হয় নাই। এই সকল করিয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছিলেন।

গুরুদাসবাবুও বিচারাসনে বসিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলিতে আমার উপকার করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিয়া ডিরেকটর সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে আমি নির্দোষ। গুরুদাসবাবু আমাকে খুব ভালবাসিতেন এবং আমিও তাঁহাকে বরাবর আন্তরিক সম্মান করিতাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন রো-সাহেব প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন অখিলচন্দ্র গুপ্ত নামে একজন কেশিয়ার কতকগুলি টাকা অপহরণ করিয়াছিল। এই বিষয়টি লইয়া তৎকালে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট প্রেসিডেন্সী কলেজের খাতাপত্র অভিট করিতে হুকুম দেন। সে ব্যক্তি আমাদের কাছে খাতা দেখাইয়া বলিলেন—“দেখুন মহাশয়গণ, কিরূপ চুরি।” কেশিয়ারবাবু খাতার এক পৃষ্ঠের নীচে যে টাকা জমা করিয়াছেন, খাতার ঐ পৃষ্ঠা উন্টাইয়া দেখা গেল—তাহার মধ্য হইতে প্রথম নম্বরটি বাদ দিয়া শেষ ৩টি নম্বর তুলিয়াছেন। রো সাহেব তাহা পরীক্ষা না করিয়া পরপৃষ্ঠায় সই করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতেছি। পাঠক মহাশয় মনে করুন—৫ম পৃষ্ঠের শেষ লাইনে ২৩৬৭।০ এইরূপ আছে। কেশিয়ারবাবু পাঠাটী উন্টাইয়া যখন ঐ নম্বর তুলেন, তখন প্রথম নম্বরটি (অর্থাৎ ২টি) না তুলিয়া কেবল ৩৬৭।০ এই নম্বর তুলিলেন। ইহাতে একেবারে দুই হাজার টাকা আশ্রসাৎ করিয়াছেন। এইরূপে অভিটার অনেক হাজার টাকা তছরূপ হইয়াছে দেখাইল। এবং গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট করিল, যে কেশিয়ারবাবু যাহা করিয়াছেন, রো সাহেব তাহা তদারক না করিয়া সই করিয়াছেন। এইটুকু তাঁহার

দোষ হইয়াছিল ; তাঁহার উচিত ছিল দেখিয়া শুনিয়া সহি করা। গবর্নমেন্ট এই রিপোর্ট পাইয়া হুকুম দিলেন—কেশিয়ারবাবুর যেখানে যে-সম্পত্তি আছে সকলগুলি বিক্রীত হইয়া গবর্নমেন্টের তহবিলে জমা হউক এবং রো সাহেবের বেতন হইতে প্রতি মাসে ৫০০ পাঁচশত টাকা কাটিয়া লইয়া গবর্নমেন্টের তহবিলে জমা হউক। যখন এই হুকুম বাহির হয় তখন অখিলবাবু কেশিয়ার কোথায় পলাইয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না। গবর্নমেন্ট হুকুম দিলেন, টিকটিকি পুলিশ কেশিয়ারকে ধরিবার চেষ্টা করুক। আর রো সাহেব সেই সময় দাজিলিঙে গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে এই হুকুম গেল যে, প্রতি মাসে ৫০০ টাকা তাঁহার বেতন হইতে কাটা যাইবে ও গবর্নমেন্ট তহবিলে জমা হইবে। আমরা শুনিয়াছিলাম—এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়া রো সাহেব (সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন) পাগল হইয়াছিলেন। এবং যে লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত, তিনি তাহাকে কামড়াইতে যাইতেন। তাহার মেম বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি গবর্নমেন্টের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, “আমার স্বামী রো সাহেব পাগল হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্ত বিলাত যাইব। স্বতরাং আমার স্বামীকে ছুটি দেওয়া হউক।” বলা বাহুল্য—রো সাহেব আর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন নাই এবং টাকাও দেন নাই।

এই রো সাহেবের আমলে একজন লাইব্রেরিয়ান কতকগুলি বই বিক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি, নূতন বইগুলি যখন ক্রয় করা হইত তখন সেগুলির রীতিমত জমা খরচ করিতেন না। অর্থাৎ পাঁচখানা বই ক্রয় করা হইল ; তিনি ৩ খানা জমা করিলেন, ২ খানা স্বয়ং বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেন। এইরূপে অনেক টাকার পুস্তক বিক্রয় করিতেছিলেন। যখন রো সাহেব এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লাইব্রেরির চাবি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। লাইব্রেরিয়ান বাবুর নামে আদালতে নালিশ করিলেন। লাইব্রেরিয়ান বাবু আদালতে গিয়া বলিয়া আসিলেন, যেদিন পর্য্যন্ত লাইব্রেরির ঘরের চাবি আমার নিকট ছিল, সেদিন পর্য্যন্ত আমি পুস্তকের হিসাব দিতে বাধ্য। কিন্তু যেদিন হইতে রো সাহেব আমার নিকট হইতে চাবি স্বয়ং লইয়াছেন, সেদিনের পর যদি কিছু চুরি গিয়া থাকে, তাহার জন্ত আমি দায়ী নহি। মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া যায়।

এদিকে গবর্নমেন্ট অখিলবাবুর যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া লইলেন। এবং অল্প দিনের পর নেপাল হইতে তাঁহাকে টিকটিকি পুলিশ ধরিয়া আনে এবং তাঁহার ১।০ (দেড়) বৎসর মেয়াদ হয়।

রো সাহেবের সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে নাটক অভিনয় হইত। ছাত্রেরা বেশভূষা করিয়া কোন বৎসর হামলেটের কোন অঙ্ক অভিনয় করিত। কোন বৎসর মিড সামার নাইটস ড্রিমের এক অঙ্ক বা দুই অঙ্ক অভিনয় করিত। কোন বৎসর ওথেলোর এক অঙ্ক অভিনয় করিত। প্রতি বৎসর এই কাৰ্য্য হইত। স্টার থিয়েটারের অন্নতবাবু আসিয়া বেশভূষা করিয়া দিতেন।

প্ৰেসিডেন্সী কলেজৰ উত্তৰ দিক্ৰ উঠানে ছাত্ৰেৰা জিমনাষ্টিক কৰিত। শ্ৰীযুক্ত যোগীন্দ্ৰনাথ সিংহ মহাশয় তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

মিষ্টাৰ লিটল যখন প্ৰথম প্ৰেসিডেন্সী কলেজৰ অধ্যাপক হইয়া আসেন, তখন আমাৰ সহিত তাঁহাৰ একটু মনোমালিন্য হইয়াছিল। প্ৰেসিডেন্সী কলেজে প্ৰতি বৎসৰ ফাৰস্ট ইয়াৰ ও থাৰ্ড ইয়াৰেৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষা হইত। সে বৎসৰ আমি ও মৌলভী ও লিটল সাহেব গাৰ্ড দিতেছিলাম। তেতালাৰ হল ঘৰেৰ উত্তৰদিকে মৌলভী সাহেব, এবং দক্ষিণ দিকে আমি, ও মধ্যস্থলে লিটল সাহেব গাৰ্ড দিতেছিলাম। লিটল সাহেব মধ্যস্থলে একখানি চেয়াৰে বসিয়া একখানি খবৰেৰ কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি মৌলভী ও আমাকে ক্ৰমান্বয়ে উত্তৰদিকে ও দক্ষিণ দিকে গাৰ্ড দিতে হুকুম কৰিলেন, এবং স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিবেন একুপ কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, যদি আপনাৰ এলাকাৰ মध्ये কোন ছাত্ৰ অপর ছাত্ৰেৰ সহিত কনসাল্ট কৰে বা পুস্তক দেখে তাহা হইলে আমাৰা আপনাৰ এলাকাৰ মध्ये যাইতে পাৰিব কিনা? লিটল সাহেব বলিলেন,—“By no means.” আমি বলিলাম, “সাহেব, আপনি প্ৰেসিডেন্সী কলেজৰ নিয়ম জানেন না; এই হলে আমাৰা ও জনেই সমান।” তাহাতে লিটল সাহেব একটু ক্ৰোধাশ্বিত হইয়া আমাকে কহিলেন, “Do you question my authority?” আমি কহিলাম—“হাঁ সাহেব।” তিনি ঐ কথা ও বাৰ বলিলেন। আমিও ও বাৰ একুপ উত্তৰ দিলাম। তাহাতে তিনি রাগিয়া টকটক কৰিয়া জুতাৰ শব্দ কৰিয়া আমাৰ নামে নালিশ কৰিতে প্ৰিন্সিপ্যাল টনি সাহেবেৰ নিকট গেলেন। এবং তাঁহাকে কি বলিলেন তিনিই জানেন। ক্ষণকাল পরে লিটল সাহেব আমাদেৰ হলে ফিৰিয়া আসিলেন এবং তৎপশ্চাৎ একটি বেহাৰা আসিয়া আমাকে কহিল “পণ্ডিতজি, বড়া সাহেব আপুকে সেলাম দিয়া।” তাহা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ টনি সাহেবেৰ নিকট গেলাম। টনি সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন। “হৰিশ। কি হইয়াছে?” আমি বলিলাম,—“আপনি কি আমাদেৰ ছ’জনকে লিটল সাহেবেৰ চাকৰ কৰিয়া পাঠাইয়াছেন?” টনি সাহেব কহিলেন, “By no means, you are all equal in the hall.” আমি কহিলাম,—“তবে লিটল সাহেব আমাদিগকে তাঁহাৰ চাকৰেৰ ত্ৰায় ব্যবহাৰ কৰিতেছেন কেন?” টনি সাহেব বলিলেন, “আচ্ছা, কাল আমি ভিন্নৰূপ বন্দোবস্ত কৰিব।” পৰদিন হইতে আমাদেৰ ও জনকে পৃথক ঘৰে গাৰ্ড দিতে হুকুম কৰিলেন। আশ্চৰ্যেৰ বিষয়, পৰদিন লিটল সাহেব কলেজে আসিয়া অগ্ৰেই আমাকে বলিলেন,—“Good morning, pandit.” আমিও বলিলাম, “Good morning, Mr. Little.” তাহাৰ পর হইতে লিটল সাহেব আমাকে একটু ভাল বাসিতে লাগিলেন, কেন জানি না। ঐ বৎসৰ আমাৰ সঙ্কলিত “ৰূপকৰত্নম” নামে একখানি বই ফাৰস্ট আৰ্ট্‌সেৰ পাঠ্য হইয়াছিল। আমি বেণী সংহাৰেৰ একটি শ্লোক ব্যাখ্যা কৰিতেছিলাম। Little সাহেব ঐ শ্লোকটি বাহিৰে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। আমি যখন আমাদেৰ বসিবাৰ ঘৰে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি কি

পড়াইতেছিলে, আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমাকে সংস্কৃত পড়াইতে হইবে। আমি একখানি মৎ প্রণীত সংস্কৃত পাঠ ১ম ভাগ আনাইয়া তাঁহাকে দিলাম এবং বলিলাম,—সাহেব ! অগ্রে বর্ণমালা শিক্ষা কর। তিনি ২৩ দিনের মধ্যে ক'থ শিখিয়া আমাকে বলিলেন, পণ্ডিত, আমি বর্ণ-মালা শিখিয়াছি। আমাকে বই পড়াও। যাহা হউক তিনি এক মাস সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পণ্ডিত, আমাকে একটি শ্লোক শিখাও।” আমি তাঁহাকে হরে মুরারে মধুকৈটভারে ইত্যাদি শ্লোকটি শিখাইয়াছিলাম। লিটল সাহেব স্কচম্যান ছিলেন ; সুতরাং তিনি “হরে” ইত্যাদি স্থানে “হড়ে” “মুড়াড়ে” বলিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ফুটবল খেলার একটি দল ছিল। গণিতজ্ঞ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম-এ ঐ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। কখন কখন ঐ দল গড়ের মাঠে খেলিতে যাইত। সেই দিন ছুটি হইত। সুতরাং আমরাও তাহা দেখিতে যাইতাম। ঐ সময় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

তখন ছোটলাট বাংলা শাসন করিতেন। নূতন শাসনকর্তা হইয়া আসিলে প্রায় প্রত্যেক ছোটলাট প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে আসিতেন। আমার মনে হয়, একবার একজন ছোট লাট আমাদের সকলের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছিলেন। সে অনেকদিনের কথা। কোন্ ছোটলাট আমার মনে নাই। তিনি জে সি বোসের একটি বেহারার কার্যদক্ষতা দেখিয়া তাহার ডবল বেতন বাড়াইয়া যান। বেহারার নাম ননকু। সে ইংরেজি পড়ে নাই, কিন্তু সব ঔষধের শিশি চিনিত। উক্ত ছোটলাট ননকু বেহারাকে যে শিশি আনিতে বলিয়াছিলেন, সে তৎক্ষণাৎ সেই শিশি আনিয়াছিল। তাহাতে ছোটলাট তাহাকে Mr. Nanku বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। ঐ বেহারার তৎকালীন আনন্দপূর্ণ মুখখানি আমার মনে পড়ে এখনও।

এক সময় কোন ছোটলাট, (আমার স্মরণ হয় না) প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে আসেন। এবং আমার ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা সকলে উঠিয়া সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্মান করিবার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কি পড়াইতেছেন ?” আমি উত্তর করিলাম—“রঘুবংশ।” তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন—“আমরা পড়িয়াছি, “আসীত্রাজা নলো নাম।” আমি বলিলাম, “আজ্ঞে হাঁ” তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—“Sanskrit is a very difficult language.”

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা শিক্ষকগণের অতিশয় বাধ্য ছিল। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে আমার আদেশানুসারে ছাত্রেরা রবসন সাহেবকে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। একবার কোন সাহেব অধ্যাপক ছাত্রদিগকে Stupid, goose বলিয়াছিলেন। ছেলেরা বিপিনবাবু ও আমাকে ঐ কথা জানাইলে আমরা পরদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ঐ কথা জানাই। প্রিন্সিপ্যাল উক্ত প্রোফেসরকে বাড়ীতে ডাকাইয়া একপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে পরদিন উক্ত প্রোফেসর সাহেব ক্লাসে আসিয়া “you gentlemen !” বলিয়া সম্বোধন

করিয়াজিলেন। ছেলেরা ঐ কথা আমাদিগকে জানাইয়াছিল। আমি ছেলেদিগকে বলিতাম, তোমরা কখন মাতাকে ইংরেজিতে পত্র লিখিও না। কারণ বাংলায় যেরূপ ভক্তিবাচক শব্দ আছে, ইংরেজিতে তাহা নাই। ইংরেজিতে মাকে ও স্ত্রীকে একরূপ কথায় সম্বোধন করিয়া থাকে,—যথা My dear mother ও My dear wife. ইহা আমাদের কর্ণে বিসদৃশ লাগে।

ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাব্যাপক রমানাথ সরস্বতীর পরলোক হইবার পর ক্রফট সাহেব আমাকে ঢাকা পাঠাইবার কথা বলিয়া ছিলেন। তাহা শুনিয়া আমার ছাত্ররা তাঁহাকে যে পত্র লিখে, তাহা পড়িয়া ক্রফট সাহেব তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজে যে ল ক্লাস ছিল, তথায় ৩ বৎসর পড়িতে হইত। যে বৎসর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় ল পড়েন, তখন আমিও ঐ সঙ্কে ল পড়ি। আমার মনে পড়ে তিনি আমাদের হাজিরা করিতেন। মাননীয় স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কিছু পূর্বে ল পড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে অনেকদিন ল লেকচারার ছিলেন, এবং তথায় প্রাক্টিস করিয়া পরে কলিকাতায় হাই কোর্টে আসেন। আমার একজন সহাব্যায়ী স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ বহরমপুরে গিয়া প্রাক্টিস করিয়া অনেক টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। তথায় একটি বাটীও করিয়াছিলেন।

তৎকালে হাই কোর্টের ইন্টারপ্রেটার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার নামক একজন কৃতবিদ্য মনীষী প্রেসিডেন্সী কলেজে হিন্দু ল ও মুসলমান ল লেকচার দিতেন। আর একজন সাহেব রোমান ল ও জুরিসপ্রুডেন্স পড়াইতেন। কিছুদিন পরে শ্যামাচরণ বাবুর স্থানে একজন সাহেব নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ব্যবস্থাদর্পণ ও ব্যবস্থাতন্ত্রিকা রচনা করেন। ঐ কার্যে আমি প্রায় ২০ বৎসর তাঁহার সাহায্য করিয়া ছিলাম।

একবার পেডলার সাহেব যখন কয়েক মাসের জন্ম অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন, তখন ঠিক ৩পূজার পূর্বে কলেজের ক্যাশ বান্ধ হইতে ১২৫ টাকা চুরি যায়। ঐ ঘরের বেহারী ঐ কাজ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহাকে ধরিতে পারা গেল না। সুতরাং ঐ টাকা এসিসট্যান্ট সেক্রেটারী ব্রজবাবুকেই দিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টের টাকা। এসিসট্যান্ট সেক্রেটারী দায়ী; কারণ তাঁহার হাত বান্ধ হইতে ঐ টাকা চুরি গিয়াছিল; কেশিয়ানের বান্ধ হইতে চুরি গেলে কেশিয়ারকেই দিতে হইত। ৩তুর্গা পূজার পূর্বে নিজ পকেট হইতে ১২৫ টাকা দিয়া ব্রজবাবু সাক্ষনয়নে অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল পেডলার সাহেবকে জানাইলেন যে, “মহাশয়! আমার বাড়ী ৩তুর্গাপূজা হইবে; আমি যদি এই টাকা নিজ বেতন হইতে দিই, তবে পূজা হইবে না। পেডলার সাহেব সমস্ত শুনিয়া পরদিন ব্রজবাবুকে ডাকিয়া একখানি ১০০ নোট দিলেন, এবং বলিলেন, “তুমি মায়ের পূজা কর।” ব্রজবাবু সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু ৩পূজার ছুটির পর যখন বেতন পাইয়া ব্রজবাবু ঐ ১০০ টাকা পেডলার সাহেবকে দিতে গেলেন, তখন পেডলার সাহেব বলিলেন, ‘ব্রজবাবু, ও টাকা দিতেছ কেন? আমি তোমাকে ত ধার দিই নাই, তুমি যখন বলিয়াছিলে

যে, ৩মায়ের পূজা হইবে না, তখন আমি ঐ পূজার জন্ত ঐ টাকা দিয়াছিলাম।” এই কথা শুনিয়া ব্রজবাবু কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমরা এই কথা শুনিয়া পেডলার সাহেবকে মনে মনে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। সাহেব যদিও দুর্গাঠাকুর মানেন না, কিন্তু আমরা তাঁহার হৃদয়ের ভাব দেখিয়া অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলাম। একবার একটি বেহারার একটি টাকা হারাইয়া যায়। বেহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পেডলার সাহেবকে জানাইল, “হজুর, আমার একমাসের খোরাক কম পড়িবে।” সাহেব তাহাকে বলিলেন, “তুমি কাঁদিও না, এই লও।” এই কথা বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। সে শত শত বার ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল। পেডলার সাহেবের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার হৃদয় অতি দয়াদ্র ছিল। তিনি আমাকে দুই বৎসর একস্টেটেশন দিয়াছিলেন বলিয়া আমি অর্দেক পেনসন পাইয়াছিলাম; নতুবা একের তিনভাগ বই পাইতাম না। একবার ডাঃ জে. সি. বোস নিজের বকৃত্য গৃহের পশ্চিম পার্শ্বে একটি কাঠ ও কাচ দ্বারা নিৰ্মিত গৃহ কোন বাঙালী কনট্রাকটর দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমরা গ্রীষ্মের ছুটির পর আসিয়া দেখিলাম মাঠের ধারে একটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাহা দেখিয়া বলিলেন, উহাতে বাড়ীর সামঞ্জস্য থাকিবে না; অতএব ঐ ঘরটি ভাঙ্গিয়া ফেল। বলাবাহুল্য ঐ ঘর করিতে যে খরচ পড়িয়াছিল, তাহা ডাক্তার জে. সি. বোসকে নিজ হইতে দিতে হইয়াছিল।

সেকালে ‘শিবরাত্রির জন্ত গবর্ণমেন্ট ছুটি দিতেন না। কিন্তু টনি সাহেব যখন জানিতে পারিলেন, যে ঐ উপবাস অনেক ছেলেরা করে, এবং ব্রজবাবু ও আমি করি, তখন হইতে এক ঘণ্টা মাত্র কলেজ হইতে লাগিল; অর্থাৎ ১১ টার পর ১ ঘণ্টা মাত্র কলেজ হইয়া ১২টার সময় বন্ধ হইতে লাগিল। সাহেব প্রফেসররা ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“এক ঘণ্টা কলেজ হইবার অর্থ কি?” আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, যে ‘শিবরাত্রি’তে হিন্দুরা ৩৬ ঘণ্টা আহার করেন না; অথচ এইটি গেজেটেড হলিডে নহে, স্ততরাং প্রিন্সিপ্যাল সমস্ত দিন কলেজ বন্ধ রাখিতে পারেন না,—(তাহা করা তাঁহার অধিকার নহে), কিন্তু ছাত্রগণ ও প্রফেসরদিগের সুবিধা করা তাঁহার অভিপ্রেত, এইজন্ত ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লিটলসাহেব শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “you pandit! you do not take a single drop of water for 36 hours.” আমি বলিয়াছিলাম। “না সাহেব।” লিটল সাহেব শুনিয়া অবাধ হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, “we would die then.” আমি বলিয়াছিলাম, সাহেব, আমরা হিন্দু, আমরা উপবাস খুব করিতে পারি। আমরা উপবাস না করিয়া কোন দেবতার উপাসনা করি না।

একদিন লিটল সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, “পণ্ডিত, আমি দেখিতেছি—তোমার জল খাবার কুঁজো ও গেলাস পৃথক স্থানে রক্ষিত হয়। তুমি আমাদের গেলাসে জল খাও না কেন? আমি জানি তোমার মতামত উদার; তবে তুমি কি জাতিভেদ বলিয়া খাও না; অথবা

অন্য কোন কারণ আছে?” আমি কহিলাম, “সাহেব, তোমার প্রশ্নে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি যে সকলের গেলাসে জল খাই না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তির মুখের ভিতর এমন ক্ষত থাকে, যে, তাহা সংক্রামক তাহার ওষ্ঠে ও কণ্ঠে যদি কোন ক্ষত থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে গেলাসে জল খায়, সে গেলাসে অপর কোন ব্যক্তি জলখাইলে পূর্বোক্ত ব্যক্তির মুখের রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিরা নিজ সংহিতাতে লিখিয়া গিয়াছেন, মাতা, কণ্ঠা ও স্ত্রী এই তিনজন ভিন্ন অঙ্গ কাহা কর্তৃক প্রস্তুত অন্ন খাওয়া উচিত নহে। যদি পূর্বোক্ত ৩ জনের মধ্যে কেহ না থাকেন তবে স্বয়ং পাক করিয়া খাওয়া উচিত। এইরূপ শাসনের নিগূঢ় কারণ আছে। ঋষিরা বিনা কারণে কোন কথা লিখেন নাই। সাহেব, আমি এই কারণে কাহারও উচ্ছিষ্ট জল বা অন্ন খাইনা। আমি কি প্রকারে জানিব যে আপনার মুখের মধ্যে কোন রোগ আছে কি না।” মিঃ গাফ নামে একজন সাহেব ফিলজ্জি পড়াইতেন। তাঁহার সহিত রি-বার্থ (অর্থাৎ পুনর্জন্ম) সঙ্ঘর্ষে আমার তর্কবিতর্ক হইত। আমি তাঁহাকে বলিতাম কর্মফল স্বীকার না করিলে ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী ও মূর্খ ইত্যাদির সমন্বয় করা হয় না। ভগবানকে গ্রায় পরায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি পক্ষপাতী নহেন। অনেক তর্কের পরে সাহেব স্বীকার করিলেন যে, কর্মফল স্বীকার না করিলে এ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না।

ইউরোপে অস্ট্রিয়া নামে একটি দেশ আছে। তথায় প্রাক্ত, ইউনিভারসিটি নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একবার ঐ স্থান হইতে আমার উপর দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠায়। ১ম-অনুস্মার ও বিসর্গের স্থান কোথায়? ২য়-মিরাকুলু প্রমাণ করিতে পার কিনা। আমি পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ হইতে অনুস্মার ও বিসর্গের স্থান লিখিয়া দিলাম,—যে, ঐ দুইটির স্থান স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে। কারণ দেখাইয়া দিয়া ছিলাম। ২য় প্রশ্ন অর্থাৎ মিরাকুলু প্রমাণ করিবার জন্য আমি ঋক্বেদের ও অথর্ববেদের অনেকস্থান ও তন্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, এবং যোগশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ দিয়াছিলাম, যে, মিরাকুল সত্য হইতে পারে।

তৎকালের ছাত্রেরা সাহেব প্রোফেসরদিগকে ভয় করিত, এবং বাঙ্গালী প্রোফেসরদিগকে ভক্তি করিত। একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। একদিন লিটল সাহেব ও আমি তেতালার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি, ঐ সময় ফোর্থ-ইয়ারের ছাত্রেরা তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের পড়ে পড়িয়া নীচে নামিতেছিল। ছাত্রদিগকে আসিতে দেখিয়া আমি সিঁড়ির একধারে দাঁড়াইলাম, সাহেব কিন্তু মধ্যস্থল দিয়া নামিতে লাগিলেন। একটি ছাত্র হাত সাহেবের হাতের সহিত সজোরে ঠাকারঠেকি হওয়াতে সাহেব তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, “Who are you?” সে কহিল, “আমি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।” সাহেব কহিলেন—“I fine you fifteen rupees.” ছাত্রটি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সাহেব তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

“প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩২।”

বিজ্ঞানের দর্শন

চঞ্চলকুমার মজুমদার—চতুর্থ বাৰ্ষিক বিজ্ঞান

আইনস্টাইন তাঁর একটি প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিককে শার্লক হোমসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।^১ ঘটনার তথ্যস্বাক্ষান করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর অল্পক্ৰম বিবেচনা করে হোমস ছুঁতিনটি সম্ভাব্য ঘটনাবেষ্টনীর কল্পনা করতেন। তারপর সমস্ত সূত্র পাওয়া গেলে তিনি নিরুদ্বেগ চিত্তে অল্প কিছুতে মন দিতেন, কারণ ছুঁতিন ঘটনার নিবিড় চিন্তাই তখন রহস্যভেদ করার পক্ষে যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিক সেইরকম আবিষ্কৃত, পরীক্ষিত বা নিরীক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করে চলেন, সমস্ত তথ্য থেকে ছুঁতিনটি প্রকল্প (hypothesis) প্রস্তত করেন, তার পর নূতন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্য তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। বলা বাহুল্য এটাই হচ্ছে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের সনাতন বিশ্লেষণ রীতি।

আইনস্টাইনের এই উক্তিটি অবশ্য দেশ-ও কালগত ভাবে সীমিত। কারণ ডিটেকটিভ বা বৈজ্ঞানিকের নিকট উপস্থাপিত হতে পারে, এমন তথ্য বিশেষভাবে দেশ ও কাল নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রকল্পের গঠন সাধারণতঃ কাল নির্দিষ্ট। কথাটা পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বিজ্ঞানী-মনের চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ বিশেষ যুগে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সমকালীন চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা। প্রকৃত পক্ষে এই চিন্তাধারা আদিম যুগ থেকে আধুনিক যুগে বিরাট প্রসারলাভ করেছে ও গভীরতর হয়েছে। তার প্রসার মূলতঃ ধীরগামী, তার বিকাশ ঘটেছে বিবর্তনের পথে। তবে মধ্যে মধ্যে যুগান্তকারী মাহুয়ের আবির্ভাবে তার গতিবেগ অকস্মাৎ বধিত হয়েছে, ধারা পরিবর্তিত হয়েছে; যেমন, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, নিউটন বা আইনস্টাইনের আবির্ভাবে।

স্ভাবতঃই বিজ্ঞানীদের চিন্তনশৈলী পরিবর্তনশীল। আধুনিক যুগে রেনেসাঁসের পর যখন সংঘবদ্ধ বিজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটে, তখনই প্রথম লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বিশ্বের সকল বিজ্ঞানী মন একটি মূল নীতিকে অল্পসরণ করতে চেয়েছে; এই ঐক্যবোধ পরিবর্তিত হয়েছে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্নদেশের মধ্যে পরিচিতি নিবিড় হওয়ার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানীদের এই মূল নীতিকে বলতে পারি বিজ্ঞানীদের দর্শন।

এই বিজ্ঞান-দর্শনের প্রগতিকে আমরা প্রধানতঃ চারটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি : যান্ত্রিক যুগের প্রতিষ্ঠা, যান্ত্রিকযুগের পতন, আপেক্ষিকতার উৎপত্তি, এবং কোয়ান্টাম মতবাদ। শেষ দুটি একই কালে বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার মধ্যে বিরাজ করেছে, এবং তারা সম্পর্কবিহীনও নয়।

^১ The Evolution of Physics—Einstein and Infeld.

যন্ত্রযুগের সূচনা করেছিলেন ইউক্লিড আর আর্কিমিডিস, ইউক্লিডের রেখাগণিত আর আর্কিমিডিসের মেকানিক্সের মধ্যে। বিশ্বজগৎ স্বয়ংবদ্ধ নিয়মের রাজত্ব। এর মধ্যে অনিশ্চয়তা কিছু নেই, সম্ভাব্যতার (probability) কোন স্থানই এখানে নেই। নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, এবং এ নিয়ম একবার জানতে পারলেই, বিশ্বের সর্বত্র আমরা তা প্রয়োগ করতে পারবো। পরীক্ষা ও নিরীক্ষার যত উন্নতি হবে, তত স্বল্প নিয়ম আমাদের আয়ত্ত হবে, এর কোন সীমা নেই। সাধারণতঃ এই নিয়ম সহজ সরল, নিউটন লিখেছেন প্রকৃতি আর ঈশ্বর সরলতারই অভিলাষী। যন্ত্রযুগকে উন্নতির শিখরে তুললেন গ্যালিলিও ও নিউটন। কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও টলেমির বিশ্বের গঠন-ধারণা পরিবর্তিত করলেন, অ্যারিস্টোটলের মতবাদ খণ্ডন করলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শনকে পরিবর্তিত করলেন না। তাঁদের পক্ষে তা করা হয়তো অসম্ভব ছিল। কারণ মধ্যযুগের ধর্মোন্মাদনা থেকে মুক্তি পেলেও ভগবানের অচল নিয়মে বিশ্বাস তাঁদের ছিল।

নিউটন এই দর্শনকে গ্রহণ করলেন। তাঁর বিরাট প্রতিভা যন্ত্রযুগকে দৃঢ়স্থায়ী করল। সুপ্রসিদ্ধ গতিবিজ্ঞানের তিনটি নিয়ম ও মহাকর্ষের নিয়মে বিশ্বজগৎকে তিনি স্থনিয়ন্ত্রিত যন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মহাকর্ষের নিয়মটি অতি সহজ, অতি সাধারণ, অথচ কত ব্যাপক, কত প্রচণ্ড তার অন্তর্নিহিত শক্তি! নিউটনকে অল্পসরণ করে ছ শতাব্দীব্যাপী পদার্থবিজ্ঞানীদের সাধনা চলেছে—বিরাট গণিতশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। শেষে দেখা গেল, মাত্র কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে থাকলে শুধু অঙ্ক কসে সূদূর বিপুল নীহারিকা থেকে আরম্ভ করে অদৃষ্ট অদৃশ্য অণুর গতিবেগ বলে দেওয়া সম্ভব। বিরাট সাকল্যের মধ্যে যন্ত্রযুগের জগৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হল। প্রমাণিত হল, তাপশক্তি গতিশক্তিরই রূপমাত্র। স্থিতিশীল তড়িৎ ও চুম্বকশক্তির গবেষণাক্ষেত্রে নিউটনকে অল্পসরণ করে কুলম্বের দু'টি নিয়ম করা হল, দেখা গেল তাতেই বেশ কাজ চলে যায়, যদিও প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করা যায় না।

যন্ত্রযুগের প্রথম ব্যর্থতা প্রকাশ করলেন হিগেল ও ফ্রেনেল। আলোকের কণাবাদ অস্বীকার করে তাঁরা আলোক তরঙ্গের কল্পনা করলেন। ইথারের যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন রূপ দেওয়া গেল না, অথচ পরীক্ষার মধ্যে আলোকতরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'ল। তারপর ফ্যারাডে প্রমাণ করলেন, চলন্ত তড়িৎ কণার কতকগুলি গুণ নিউটন পরিকল্পিত জগতের বাইরে। যেমন, নিউটনীয় বিজ্ঞানে ছুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ জন্মিত বা স্থিতিশীল বৈদ্যুতিক বা চুম্বকীয় যে কোন শক্তিরই 'বল' প্রযুক্ত হোক না কেন, তা ঐ ছুটি বস্তুর সংযোগকারী সরল রেখার উপরে থাকবে, চলন্ত তড়িৎকণার বেলায় এ নিয়ম চলতে পারে না। ফ্যারাডে এবং তাঁকে অল্পসরণ করে ম্যাক্সওয়েল "ফিল্ডের" কল্পনা করলেন; কোন পদার্থ কোন বিশেষ কারণে তার চতুর্পার্শ্বে যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার নাম দেওয়া হল 'ফিল্ড' এবং এই ধারণা বহুক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ম্যাক্সওয়েল দেখালেন যান্ত্রিক ধারণা ছাড়াও বিশ্বের অল্প ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের দর্শন পরিবর্তিত হতে লাগল; পরীক্ষা

করে দেখা গেল, যান্ত্রিক মতবাদ ত' নয়ই, ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যাচুম্বকীয় তরঙ্গের ধারণাও আলোকের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিকিরিত রশ্মির প্রকৃতি নিয়েও অনেক পরীক্ষা চলছিল, যার ফলে ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের আর একটা মৌলিকধারণা “সম্মতির” (continuity) বিলোপ ঘটল। যন্ত্রযুগের অভ্যুত্থান ও পতনের বিষয়কর, চিত্তাকর্ষক ইতিহাসে মানব-প্রগতির একটা বড় অধ্যায় অস্থিত হল।

বিশ্বশতাব্দীর প্রারম্ভে এই পরিবর্তনের মধ্যে উদ্ভূত হল আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মতবাদ। প্রথমটিতে নিউটনীয় ও ইউক্লিডীয় বিশ্বের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। আইনস্টাইন চতুর্মাত্রিক বিশ্বের পরিকল্পনা করলেন, আপেক্ষিক তত্ত্বে তিনি প্রমাণিত করলেন নৈসর্গিক ঘটনার একটা নিরপেক্ষ নৈর্বাচনিক ধারণা সম্ভব নয়। প্রকৃতির রূপদর্শনে দর্শকের স্থান গৌণ ত নয়ই, বোধহয় সর্বপ্রধান। নিউটনীয় বিজ্ঞান স্থনির্দিষ্ট দ্রষ্টাকে লক্ষ্য করে গঠিত নয়, কাজেই তা এক বিরাট শূন্যে অবলুপ্ত হবে। অথচ প্রত্যেক স্থনির্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করে বিশ্বের রূপবর্ণনা সম্ভব; এবং বিশ্বের ঘটনাবলীকে গাণিতিক সূত্রে নিবন্ধ করা যেতে পারে। এই গাণিতিক সূত্রের রূপ প্রত্যেক অবলম্বিত বস্তুতেই এক!^২ মহাকর্ষের অস্তিত্বও দ্রষ্টা সাপেক্ষ। মহাকর্ষের ব্যাখ্যাতেও আইনস্টাইন ম্যাক্সওয়েলের ফিল্ডের ধারণাকেই পরিবর্তিত করলেন।

কোয়ান্টাম মতবাদ প্রথমে তুলেছিল আলোক বিকিরিত রশ্মি, জড়পদার্থ ইত্যাদির মৌল গঠন নিয়ে। পরীক্ষাতে প্রমাণিত হল, এদের মৌলিক বস্তুগুলি সমধর্মী। নিউটনীয় বিজ্ঞান এই বস্তুর “সত্য” রূপ জানতে চাইত, নতুবা তাকে স্বীকার করা যেত না। কোয়ান্টাম খণ্ডিত আয়রার এদের প্রকৃতি জানতে পারি, তথাকথিত “সত্য” রূপটি জানতে চাই না। প্ল্যাঙ্ক সম্মতিকে অস্বীকার করেছিলেন, হাইসেনবার্গ আর এক ধাপ অগ্রসর হলেন তাঁর অনিশ্চয়তার নিয়মে। এ নিয়মে স্বীকৃত হল, কোন একটামাত্র পরীক্ষাতে একট বস্তুর সমগ্ররূপ ধরা পড়তে পারে না, পরীক্ষা নিরীক্ষার নৈপুণ্যের একটা সীমা আছে। যেমন ধরা যেতে পারে আলোকের কথা; আলোক কতকগুলি ক্ষেত্রে তরঙ্গের রূপ, কতকগুলি ক্ষেত্রে বস্তুকণার রূপ পরিগ্রহ করছে। আলোকের একটা দ্বৈতরূপ আছে। তা হলে, আলোক “আসলে” কি? এ প্রশ্নের উত্তরে হাইসেনবার্গ বলেছেন, আমাদের ধারণার সীমিত খণ্ডিত প্রকৃতিই এই দ্বৈতরূপের প্রশ্ন তুলেছে; তরঙ্গ বা কণিকা দুটির পৃথক ধারণা আমরা অর্জন করেছি, কিন্তু তাদের সহ অস্তিত্ব নেই একথা বলতে পারি না।^৩ তদ্বীয় পদার্থবিজ্ঞান এই অনিশ্চয়তার নিয়মে বাঁধা, তাই যা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা (probability)। সম্ভাব্যতার কথাতে একটা প্রশ্ন উঠে: এর মধ্যে কি আধুনিক বিজ্ঞান কার্যকারণ সূত্রকে লঙ্ঘন করেনি? হাইসেনবার্গের নিয়মে এর উত্তর আছে। আমরা যদি পরীক্ষার দ্বারা কোন মুহূর্তে পরমাণুর গতির একটা পরিমাপ করতে পারি, তবে পরে

^২ Relativity Special and General Theory—Einstein, 1920.

^৩ Principles of Quantum Mechanics (Chicago Lectures)—Heisenberg.

আর তার অবস্থান স্থনির্দিষ্ট করতে পারি না। আমাদের পরীক্ষা এমন একটি পরিবর্তন সাধন করে যার ফল পরবর্তী কোন পরীক্ষাতেই অপস্থত হতে পারে না। নীলম্ বোর বলেছেন, যদিও অনিশ্চয়তার নিয়মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও গভীর জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়, তবু আমরা এই পরীক্ষাজনিত অনির্দেশ্য পরিবর্তনের মধ্যেই অনিশ্চয়তার উৎস সন্ধান করতে পারি। কার্যকারণ সূত্রের ব্যতিক্রমের মূলে হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার অপরিচ্ছন্নতা, যা দূর করা একেবারেই অসম্ভব।^৪

আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মতবাদের সাধর্মা হচ্ছে চিন্তাধারার বিশিষ্ট ভঙ্গির মধ্যে। এডিংটন এই বৈশিষ্ট্যকে বলেছেন “epistemological approach”।^৫ এর মানে হচ্ছে এই যে, কোন ঘটনাকে শুধু ইন্ডিয়গ্রাফ হলেই স্বীকার করা হবে না, তার পারিপার্শ্বিক ও পরিপ্রেক্ষিত, দ্রষ্টা বা শ্রষ্টাকেও বিচার করতে হবে। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতায় এর সূত্রপাত করেন। সমস্ত আপেক্ষিকতাবাদই এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। কোয়ান্টাম মতবাদেও এই ভঙ্গিকে আশ্রয় করা হয়েছে। বিশ্লেষণের চারটি স্তর পূর্বেই বলেছি—নিরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ, প্রকল্প, পরীক্ষা, এবং তত্ত্বোদ্ঘাটন। আধুনিক বিজ্ঞানে আইনস্টাইন দেখালেন যে প্রকল্প যে শুধু তথ্য অবলম্বন করেই গড়ে উঠবে তার বাধ্যবাধকতা নেই। তথ্য-বিহনে নিগূঢ় কল্পনা বা বিমূর্ত চিন্তাতেও প্রকল্প গঠিত হতে পারে—কল্পিত কোন পরীক্ষাও প্রকল্পের ভিত্তি হতে পারে। এই ভাবে যে প্রকল্প গড়ে উঠলো, তাকে গাণিতিক প্রতীকে অভিব্যক্ত করে গাণিতিক বিশ্লেষণ চললো: হয়তো গাণিতিক বিশ্লেষণে অজ্ঞাত কোন বস্তুর অস্তিত্ব ঘোষিত হল। পরীক্ষায় তার প্রমাণ হবে। গণিতেরও রূপ যথেষ্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে, অবশ্য যৌক্তিকতা লঙ্ঘন না করে। এই গবেষণার সার্থকতা কিন্তু একান্তই নির্ভরশীল ঐ শেষের পরীক্ষাটির উপরে; পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হলেই এর সার্থকতা, নচেৎ এটা মূল্যহীন। এই প্রসঙ্গে ডিরাকের মন্তব্য প্রাধান্যযোজ্য: The only object of theoretical physics is to calculate results that can be experimentally verified, and it is quite unnecessary that any satisfying description of the whole course of the phenomena should be given.^৬ এখানে আমরা উদ্দেশ্য স্থির করে স্ববিধামত পরীক্ষা সাজিয়ে নিয়েছি; সুতরাং পরীক্ষার ফল কি হতে পারে তারও একটা সম্ভাব্য ধারণা আমাদের আছে। এই ধরণের পরীক্ষা ও গবেষণাকেই এডিংটন বলেছেন “epistemological approach”। বলা বাহুল্য, এই রীতির বলেই কোয়ান্টাম মতবাদ অস্পষ্টতা দূর করতে পেরেছে। আধুনিক পদার্থবিদ্যার এই রীতির দুটি সাফল্য উল্লেখযোগ্য: প্রথমটি পসিট্রনের আবিষ্কার। ডিরাকের ইলেক্ট্রন-থিওরীতেই

^৪ Nature—N. Bohr. Quoted in Dirac.

^৫ The Philosophy of Physics—Eddington.

^৬ The Principles of Quantum Mechanics—Dirac.

এর অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি, মেসনের আবিষ্কার; জাপানী বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় এর অস্তিত্ব পূর্বেই জানা গিয়েছিল।

আধুনিক যুগের এই বিজ্ঞানদর্শন বিজ্ঞানের প্রসার বিচিত্র ও বহুধা করে তুললেও সাধারণ চিন্তার সঙ্গে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। অবশ্য ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানও সাধারণ্যে নেমে আসেনি। কিন্তু তা ছিল সাধারণ বুদ্ধিগম্য, তার বর্ণনাতে চিত্রেবাহুল্য ছিল, সেটা সাধারণ মননশক্তির অনায়ত্ত্বিগম্য ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞান যে ধারণার আশ্রয় নিয়েছে তা গণিতশাস্ত্রের প্রতীকের দুরূহ দুর্গে নিবদ্ধ। তার চিত্রসম্পদ নেই, তাকে কথায় প্রকাশ করা যায় না বলেই ডিরাক অভিমত দিয়েছেন।^৭ এককথায় সাধারণ অহুসন্ধিস্থর কাছে পদার্থবিজ্ঞান ক্রমশঃই দুর্জয় হয়ে উঠছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানের চিত্র বা 'মডেল' সঠিক ধারণা না দিয়ে অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। বহু ক্ষেত্রেই মডেল পাওয়া সম্ভব হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনে মডেলের স্থান নেই, গাণিতিক বিশ্লেষণের মধ্যে অস্পষ্টতার স্থানে স্পষ্টতা আসছে, অন্ধকার অপসারিত করে আলো, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা। কিন্তু আপাততঃ তা ঘটেছে সৌন্দর্য ও সরলতাকে বাদ দিয়ে—এ যেন সমধর্মিতার অন্বেষণ করতে করতে বিচিত্র মুখশ্রীর অন্তরাল থেকে আমরা বার করেছি অপরিচিত ভয়াবহ কক্ষাল।

নিঃসন্দেহে বিংশশতাব্দীর এই বিজ্ঞানদর্শন বৈজ্ঞানিকদের পরিতৃপ্তি দিয়েছে এক বিরাট শক্তি ও অমিত সম্ভাবনা নিয়ে। অণু-পরমাণুর নিঃসীম শক্তিকে লাভ তাঁরা করেছেন, উপরন্তু মহাজাগতিক বহু রহস্যের সমাধান সহজসাধ্য হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা এ দর্শন প্রাণবান, গতিশীল, দ্রুত বিবর্তমান। তবু বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানী দর্শনে ভূয়োদর্শনের অভাব ঘটেছে; এ দুই সম্মিলিত হলে বিজ্ঞানী-সমাজের অপাংক্তয়দেরও বিজ্ঞানের রাজ্যে অপ্রতিহত প্রবেশ ঘটবে।

৭ Introduction : The Principles of Quantum Mechanics—Dirac.

শেষের কবিতা

শরদিন্দু ভট্টাচার্য—প্রাক্তন ছাত্র

কেটি : অমিত

মুখ্যত অমিত-লাবণ্যর প্রেমকে ঘিরেই 'শেষের কবিতার' কাহিনী-অংশ গড়ে উঠেছে। 'সংঘাত' দিয়ে এর সূত্র, 'শেষের কবিতায়' এর সমাপ্তি। কিন্তু তার অনেক আগেকার একটি দৃশ্য আমরা দেখেছি : অক্সফোর্ডে অমিত কেতকীর হাতে আংটি পরিয়ে দিয়ে ওর কানে কানে আবৃত্তি করছে কীট্‌স-এর কবিতা :

Tender is the night.

And haply the queen moon is on her throne.

অনুরূপ একটি ছবি আমরা দেখছি উপস্তাসের শেষভাগে—হৃদের জলে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে কেতকী তার হাল ধরেছে এবং অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে,

“আর কতদূরে নিয়ে যাবে য়োরে

হে স্নন্দরী—।”

এর মাঝখানে কেতকীর জীবনে ঘটে গেছে বহু পরিবর্তন, সে জন্মান্তর লাভ করেছে। অমিত কেতকীর সম্পর্কে গভীরতা ছিল না আদৌ। তাদের সে সম্পর্ক স্থায়ী হয় নি। অমিত নিজেই বলেছে, মানুষের জীবন হচ্ছে আকস্মিকের গাঁথা মালা ; জীবন চলে অভাবনীয়ের ধাক্কাই ধাক্কাই, ঝাঁপতালের লয়ে। সেখানে ধারাবাহিকতা নেই, শৃঙ্খলাও নেই। কথাটা আর কারুর সম্বন্ধে না হোক, অমিতের সম্বন্ধে খুবই সত্যি। কাজেই কেতকীর সঙ্গে অমিতের সম্পর্ক কেন স্থায়ী হল না, একথা ভেবে আমরা অবাক হই না। আর লিলি গান্ধুলির সঙ্গে অমিতের কথাবার্তা থেকে তো স্পষ্টই বোঝা যায় অমিত কেতকীকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিল। কেতকী অমিতকে ভালোবেসেছিল। অমিতের সঙ্গে প্রথমবার সম্পর্কচ্ছেদ এবং দ্বিতীয়বার সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারে কেতকীর ভূমিকা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এই পরিবর্তনের উৎস সন্ধান করতে হবে অমিতের চরিত্রেই।

অমিত কেতকীর কাছে প্রকৃত প্রেমের পরিচয় পায় নি। তাই তার বৈচিত্র্য-সন্ধানী মন অনায়াসেই কেতকীকে দূরে ঠেলে দিতে পেরেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রেম ও বিবাহ ছিল ওর কাছে সমব্যাপক। কাজেই যেখানে সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান পায় নি সেখানে বিবাহ করার কল্পনাই সে করতে পারে নি। কিন্তু কেতকী অমিতকে বুঝতে পারে নি বলেই বৃদ্ধদের ওপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করেছিল। কলকাতায় আমরা যে উৎকট ফ্যাশানের মোড়ক কেটিকে দেখি, যার চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘুচে গিয়ে ছুরির ধার ঝলকে উঠছে, যার ঠোঁটের

সৌকুমারের স্থানে একটা বাঁকা অঙ্কুরের ভাব স্থায়ী আসন গেড়েছে, সে এই ব্যর্থতারই সৃষ্টি। নইলে দ্বিতীয়বার অমিতের ভালোবাসা পেয়ে সে তার কিস্তুর রং যুটিয়ে স্বাভাবিক হতে চাইবে কেন? কিন্তু স্টাইল-পাগল অমিত, যে সহজ ও স্বাভাবিক কেতকীকে গ্রহণ করতে পারে নি, সে ফ্যাশানের চলন্ত বিজ্ঞাপন এই কেটিকে বিয়ে করল কি করে? এই পরিবর্তনের জন্তে কেটি কতটা দায়ী? অবশ্য শিলঙে লাভণ্যর সামনে আংটি খুলে দেবার সময় কেটির এনামেল করা মুখের পর দরবিগলিত অশ্রু আমরা দেখেছি। কিন্তু ঐ এক ফোঁটা অশ্রুই কি অমিতের জীবনে এতবড় পরিবর্তন এনে দিল? কলকাতার সমাজের যেটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায় অমিত বহু তরুণীর সংস্পর্শে এসেছে। অনেকেই হাত বাড়িয়ে তাকে পেতে চেয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সকলেই। এতটুকু আন্তরিকতা কি তাদের কারুর ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তাহলে অমিত কি করে কেটিকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করল? অমিতের এই পরিবর্তনে কেটির ভূমিকা খুব সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা যায় না। কারুর কারুর মতে অমিত-কেতকীর বিবাহ “শেষের কবিতার” একটি দুর্বল গ্রন্থি। অমিতের এই পরিবর্তনের কোনো বিস্তৃত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দেন নি। অমিতের এই সিদ্ধান্ত যেন আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতার 'পর বেশি দাবি করে। কিন্তু আমার মনে হয় শুধু কেটির যোগ্যতা বিচার না করে অমিতের চরিত্রের মধ্যে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা খুঁজলে এটা এত অস্বাভাবিক ঠেকবে না।

অমিত : লাভণ্য

মেয়েদের প্রতি অমিতের পক্ষপাত ছিল, কিন্তু সে পক্ষপাত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বিশেষ ভাবে কোনো মেয়েকেই ওর চোখে ধরে নি। কিন্তু শিলঙ পাহাড়ে মোটর সংঘর্ষের পর-মুহুর্তে আসন্ন মৃত্যুভয়ের পটভূমিকায় লাভণ্য একটা অপরূপ বৈশিষ্ট্য নিয়ে অমিতের চোখের সামনে দেখা দিল। লাভণ্যর মধ্যে যে-বস্তুটি অমিতকে আকর্ষণ করেছিল সে হচ্ছে বুদ্ধির প্রসন্ন দীপ্তি। কমলহীরের পাথরের ভারটা ছিল নেপথ্যে, কিন্তু তার উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়েছিল লাভণ্যর মুখে। লাভণ্যর রূপ প্রভাত আলোর মত, তাতে অস্পষ্টতার কুয়াসা বিন্দুমাত্রও নেই। লাভণ্যর বুদ্ধির এই অপরূপ স্বচ্ছতা অমিতকে টেনেছিল। আবার এই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ বুদ্ধিই তাদের বিচ্ছেদের কারণ।

প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির জন্তে লাভণ্যকে অমিতের যতখানি প্রয়োজন ছিল অমিতকে লাভণ্যর প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশি। পিতার ইচ্ছা-অনুসারেই লাভণ্য বিচার ছুর্ভেগ্য দুর্গে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভীক, লাজুক শোভনলালের সাধ্যই ছিল না সেই অটল দুর্গে ফাটল ধরায়। শোভনলালের ভীক অথচ একনিষ্ঠ প্রেমকে লাভণ্য রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। পিতার হৃদয়দোর্বল্যকেও সে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে নি। অমিতের উদ্দাম প্রাণ— চাঞ্চল্য এবং অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব লাভণ্যকে স্পর্শ করল। অমিতের প্রেম এবং সেই প্রেমের

অকৃষ্ট, বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ লাভব্যয় রুক্ষমনের দরজা খুলে স্বপ্ন নারীস্বকে জাগিয়ে দিল। লাভব্যয় বিজ্ঞানবত্তার ধূসর মরুভূমিতে প্রেমের ফুল ফোটানই অমিতের কাছে লাভব্যয় সবচেয়ে বড় ঋণ। লাভব্যয় যে শিক্ষক জাতীয় নয়, নারীজাতীয়, এ আবিষ্কার শুধু যতিশংকরের নয়, লাভব্যয় নিজেরও।

অমিত জন্ম—রোম্যান্টিক। অসম্ভবকে পাবার দুরাশা ওর জীবনের অবলম্বন। একই সঙ্গে রাজস্ব ও রাজকণ্টাকে লাভ করা, একই নারীতে প্রণয়িনী ও গৃহিনীকে আবিষ্কার করা ছিল ওর লক্ষ্য। লাভব্যয় সঙ্গে বিচ্ছেদকে যে দৃষ্টিতে সে দেখেছে তাতে মনে হয়, লাভব্যয়কে ভালোবেসে অমিতের এ ভ্রম কেটেছে। কিন্তু কেটিকে ঝরপে সে গ্রহন করেছে তাতে সন্দেহ হয়, অসম্ভবের মোহ ওর এখনও সম্পূর্ণ অপগত হয় নি, হয়তো এ-ই অমিতের শেষ ট্রাজেডি নয়।

লাভব্যয় কবি নয়। “জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। * * * * আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জগ্ৰেই।” ওর স্বচ্ছ বুদ্ধির কাছে অস্পষ্ট বা আচ্ছন্ন ছিল না কিছুই। নিজের মনকে যেমন স্পষ্টভাবে জেনেছে, অমিতকে তার স্বরূপে দেখতেও ওর ভুল হয় নি। নিজেকে যেমন মিথ্যে দিয়ে ভোলায় নি তেমনি ওদের প্রকৃত সূক্ষ্ম ও তার ভিত্তি সম্পর্কে অমিতের মনে যাতে কিছুমাত্র ভ্রান্তি না থাকে সে চেষ্টাও সে করেছে। সেই জগ্ৰে অমিতের প্রতি কঠিন হতে ওর বাধে নি। লাভব্যয় প্রথম থেকেই জানত অমিতের মত লোককে ভালোবাসা যায়, কিন্তু তাকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না। যে-লাভব্যয়কে অমিত ভালোবেসেছে সে যতটা মানবী ততটা কল্পনা না হলেও কল্পনার খাদ যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তবের রুঢ় স্পর্শ লেগে সে মানসী প্রতিমা ভেঙে পড়বেই। “আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সহিতে পারবে, সেই জগ্ৰে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।” অমিত কথা দিয়ে লাভব্যয়কে ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু লাভব্যয় জানে, কথা যেদিন ফুরোবে, যেদিন ক্লাস্তি আসবে, সেদিন মোহমুক্ত দৃষ্টিতে লাভব্যয়কে দেখে অমিত ওর মধ্যে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব বা আকর্ষণ খুঁজে পাবে না। প্রেমের এই অপমৃত্যু লাভব্যয় সহিতে পারে না। মোহমুক্তির চরম আঘাত থেকে অমিতকে অব্যাহতি দেবার জগ্ৰেই লাভব্যয় অমিতকে বিয়ে করতে সম্মত হয় নি। তাই সে বলছে : “বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে।” যে সজীব কল্পনা অমিতের মনে লাভব্যয়র মানসীরূপকে শাস্ত করে রাখতে পারে তার পক্ষসঞ্চালনের জগ্ৰে প্রচুর পরিসর প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনে দু’জনের সংসার তার তুলনায় অনেক সঙ্কচিত। অমিত নিজেও একথা জানত, কিন্তু মানতে চাইত না। সংসারে নববধু লাখে একটা পাওয়া যায়, কিন্তু যখন পাওয়া যায় সে চিরকালই নববধু থাকে, এই হচ্ছে অমিতের অভিমত। কিন্তু “আমাদের সকলের চেয়ে বড় যে-পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি”—একথাও অমিত অস্বীকার করতে পারে নি।

শুধু একটি মুহুর্তে লাবণ্যর যুক্তিবাদী মন পরাজয় স্বীকার করেছিল। ঘনবর্ষার ঘনঘটা ঝড় তুলেছিল লাবণ্যর অন্তরে। ওর নারীসত্তা জেগে উঠেছিল আত্মসমর্পণের আকুল আবেগে, তারপর ভাঙাঘরে অমিতের কচ্ছসাধন দেখে সে বিয়ে করতে সম্মত হল। কিন্তু লাবণ্যর বাস্তববুদ্ধি যে এতে সমর্থন জানায় নি, একথা স্পষ্ট।

অমিত ও লাবণ্য পরস্পরকে প্রেমের যে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিতে পারে, সে হচ্ছে মুক্তি—একথা সিসি ও কেটির শিলঙে আগমনের পর উভয়েই বুঝতে পেরেছিল। লাবণ্য স্পষ্টভাবে বুঝেছিল, কারণ নিজেকে সে ভোলায় নি কখনও। অমিত বুঝতে চায় নি, কারণ এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করতে তার অন্তর সায় দেয় নি। অমিতের সমাজ লাবণ্যর সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে, সেখানে লাবণ্য কিছুতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। এ অবস্থায় লাবণ্যকে বিবাহ করার অর্থ সে-সমাজ থেকে অমিতের বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের ক্ষতি শুধু নিজের প্রেম দিয়ে পূরণ করতে পারবে না লাবণ্য একথা ভালোভাবেই জানত। অমিত কথাটাকে বুঝেও অস্বীকার করতে চাইছিল। অমিতের ঘর, সে ডায়মণ্ডহারবারের বাগান-বাড়িই হোক আর পাঁচাত্তর টাকার বাসাই হোক, সেখানে লাবণ্যের স্থান হবে না। সেইজন্তেই অমিত ঘর ছেড়ে পথে পা বাড়াতে চাইল বণ্টাকে নিয়ে। “ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দু’জনের।” এই নানান লোকের ঘরে বণ্টাকে আবদ্ধ করলে তার প্রাণের শ্বাসরোধ করা হবে এ কথা উপলব্ধি করে অমিত পথচলার নতুনত্ব দিয়ে প্রথম প্রেমের বিস্ময়কে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

আর একটি কথা। লাবণ্য যে শোভনলালকে বিয়ে করবে এবং অমিত কেটিকে, এটাই যেন স্বাভাবিক। প্রকৃতির এ-ই যেন অভিপ্রায়। লাবণ্য বলেছিল, বিয়ের পাকে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুষ বড় বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক থাকে না। কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। গড়ে নেওয়া মানে যদি হয় কল্পনা করে নেওয়া, তাহলে কথাটা সত্যি। কিন্তু গড়ে নেওয়ার অর্থ যদি হয় মিলনকে সম্পূর্ণতর করবার জন্তে পরস্পরের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের পরিবর্তন—আর এই অর্থেই যোগমায়া গড়ে নেবার কথা উল্লেখ করেছিলেন— তাহলে একজনের পক্ষে অপরকে গড়ে নেওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তারও ক্ষেত্রভেদ আছে। লাবণ্য জানত, রুচির ওপর জুলুম অমিতের সহিবে না। এবং সে বলত আপন “রুচির জন্তে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করিনে।” দু’জনেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ওদের স্বভাবের বিভিন্নতা প্রচুর। এ অবস্থায় একজনের পক্ষে অপরকে প্রভাবিত করা কঠিন। অত্যাধিক অমিতের পক্ষে কেটিকে নিজের মত করে গড়ে নেওয়া সহজ এবং ওই কাজেই ওর আনন্দ। গ্রন্থের শেষদিকে দেখতে পাই অমিত কেটির বর্ণাস্তরসাধনে নিজেকে নিয়োগ করেছে।

অমিত এবং লাবণ্য পরস্পরের কাছে যা পেয়েছে সে হচ্ছে প্রেমের অসীমতার উপলব্ধি। অমিতের প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে লাবণ্যর স্তম্ভসত্তা জেগে উঠেছে। আর অমিত ছেনেছে প্রেম অসীম ও বিচিত্র। যে বিশেষ সীমিত ব্যক্তিটিকে অবলম্বন করে প্রেমের

বিকাশ প্রেম তার চেয়ে বেশি ব্যাপক। তাকে বিবাহ করলে প্রেম আর বিবাহ দু'কূলই হারাতে হয়।

সমালোচক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অমিতের পক্ষে কেটিকে বিবাহ করা উপন্যাসের শিল্পরীতির বিরোধী, তিনি অবাক হয়েছেন এই ভেবে যে “দ্বিধিজয়ী, দিগন্তরেখার ঠায়ই স্পর্শাতীত ‘অমিট রে’ শেষে অভিমানগলানো এক ফোঁটা অশ্রুর ফাঁদে পা দিল!” প্রশ্ন করেছেন: “তাহার প্রেমের বিজয়রথ কি অশ্রুশঙ্কু মরুভূমির উপর দিয়াই চালিত হইয়াছিল?” এ প্রশ্নে আগেই বলেছি, অমিত যে কেটিকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছে তার জন্তে কেটির অশ্রু ততটা দায়ী নয় যতটা দায়ী লাভণ্য এবং অমিত নিজে। অমিত গৃহিণীর মধ্যে প্রেমিকাকে লাভ করার ছুরাশা ছেড়েছে। তা ছাড়া প্রেম অমিতের মধ্যে এনে দিয়েছে বিপুল পরিবর্তন। জীবন ও জগৎকে সে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে। “এখানে এসে, আশ্চর্য্য এই যে স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন কি, তারা গানও গায়।” এইজন্তেই অশ্রুমুখী কেটিকে বিবাহ করতে অমিতের বাধে নি।

লাভণ্য : শোভনলাল

অমিত সাতফুটোওয়াল বাঁশের বাঁশি, ফুৎকারমাত্রেরি বেজে ওঠে; শোভনলাল পাকা বাঁশের লাঠি, তার ওপর নির্ভর করা চলে। বুদ্ধিমতী লাভণ্য একথা বুঝতে ভুল করে নি। লাভণ্য একদিন শোভনলালের সলজ্জ, কুণ্ঠিত প্রেমের মর্যাদা দেয় নি, কারণ প্রেমের সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল না। আজ অমিত ওর মনকে জাগিয়ে দিল। সে নিজেকে চিনল। “সন্ধ্যার বেউলাদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান”—একথা লাভণ্যকে অমিত যেমন বলতে পারে, লাভণ্যও তেমনি অমিতকে বলতে পারে। তখনই লাভণ্য শোভনলালকে বুঝল, তাকে গ্রহণ করল। এখানে প্রশ্ন জাগে: লাভণ্য কি করে দু’জনকে ভালোবাসল? অমিতকে সে ভালোবেসেছে, শোভনলালকেও তো ফাঁকি দেয় নি। লাভণ্যর প্রেম দু’জনই পেয়েছে, কিন্তু ভিন্নরূপে। অমিতকে যে-অপরিবর্তন অর্থাৎ লাভণ্য উৎসর্গ করেছে, সে বিশুদ্ধ প্রেম। শোভনলালের সঙ্গে লাভণ্যর যে-সম্বন্ধ, সে শুধু প্রেমের নয়, বিবাহের। যেখানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে বেছে নেয়, সেখানে বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

“যে আমাদের দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়

ভালোমন্দ নিশায়ে সকলি”

তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করে লাভণ্য তার নারীজনোচিত বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

অমিত বলেছিল, “শিমুল কাঠই হোক আর বকুল কাঠই হোক, যখন জলে তখন অগুনের চেহারাটা একই।” কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। আর সত্যি যে নয় অমিত নিজেই তার প্রশ্ন দিয়েছে। ষড়ায় তোলা নিত্য-ব্যবহারের জল আর সাঁতার দেবার দীঘি, ওড়বার

আকাশ আর ডানা গুটিয়ে বসবার ছোট্ট বাসা যে এক নয়, অনেক দেখে এ বোধ অমিতের হয়েছে। শোভনলালের প্রতি লাবণ্যর যে মনোভাব সে হচ্ছে স্ত্রীর মনোভাব। তাতে প্রেমিকাভাব যেমন আছে মাতৃভাবও তেমনি আছে। স্ত্রী স্বামীকে অসাধারণ বলে ভাবে। আবার স্বামী যে অসহায়, জীবনের পথে চলতে স্ত্রীর সহায়তা ছাড়া সে পশু, এ অল্পভূতিও সে এড়াতে পারে না। কিন্তু অমিতের প্রতি এই মনোভাব যেমন অসম্ভব, শোভনলালের প্রতি তেমনি স্বাভাবিক। পরস্পরকে গড়ে নেবার সম্পর্ক অমিত-লাবণ্যর মধ্যে সম্ভব নয়, কিন্তু লাবণ্য-শোভনলালের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক এইটাই। অমিতের ভালোবাসা পেয়ে এবং অমিতকে ভালোবাসেও শোভনলাল কাছে এসে দাঁড়াতেই লাবণ্য কেন তাকে গ্রহণ করল তার রহস্য এখানেই।

শেষের কবিতা

অমিতের জীবন আকস্মিকের গাঁথা মালা, ওর মনটা সত্যিই আয়না। এইজন্তে অমিত কখনও পুরনো হয় না। অমিতকে চিনতে চিনতে চেনার বিষয় কখনও ফুরিয়ে যায় না। অমিত তার শেষের কবিতায় লাবণ্যকে যা বলেছে এ-কথা এ-ভাবে সে আগে আর বলে নি। এখানেও তাই সে “অভাবনীর কচিং কিরণে দীপ্ত।”

কিন্তু লাবণ্যর জীবন যুক্তি-পরস্পরায় গাঁথা মালা। ওর মধ্যে স্ব-বিরোধিতা নেই, আকস্মিকতার চমক নেই; লাবণ্যর আচরণ পূর্বপ্রত্যাশিতের এলাক। ছাড়িয়ে প। দেয় না। অমিতের চেয়ে সে বেশি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু পাঠকের কাছে বেশি আকর্ষণীয় নয় নিশ্চয়ই। লাবণ্য এ-পর্যন্ত যা বলেছে, যা করেছে, তারই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লাবণ্যের শেষের কবিতা, এবং সমস্ত অতীতদর্শী ব্যাখ্যার মতই তাতে যেন একটা ক্লাস্তিকর দীর্ঘতা আছে। বক্তব্যের নতুনত্ব এবং ভাষার সংহতিতে অমিতের শেষের কবিতাকে লাবণ্যর কবিতার চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে।

একটি সুখী পরিবার*

—প্রণবকুমার বর্দন—চতুর্থ বর্ষ কলা

“...যা মনে আসে অনর্গল তাই যদি লিখে যাওয়া যায়, তবে সে লেখা একটা অফুরন্ত উজ্জলতার উৎস হয়ে থাকে সূর্য্যের আলোর মত, পাথর-ঘষা ফুলিঙ্গের মত নয়। সেইটেই হচ্ছে সত্যিকারের আর্ট। আর যিনি অমন লিখতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন সত্যিকারের আর্টিষ্ট।

...কিন্তু আমি?.....আমার স্থান কোথায়?”

এতদূর ভেবে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল সে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, কলম চালিয়ে কিছু টাকা রোজগার করতেই হবে তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্তে। Happy Monthly-এর প্রকাশকদের কাছে লেখা পাঠাবার কথা ত' সে আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছে। এর কারণ অবশ্য এই যে ওরা পারিশ্রমিকের ব্যাপারে একটু দরাজ-হস্ত, তাই না? কিন্তু একটা মুশ্কিল, ওখানে লিখতে গেলে বিষয়নির্বাচনের গণ্ডীটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, এর বাইরে গেলে হয়ত লেখা ছাপবে না। ঠিক আছে, বহুং আচ্ছা,—হোক না সীমাবদ্ধ। আচ্ছা, দেখা যাক ত', কোন্ কোন্ প্রধান সমস্তা আজকালকার তরুণসম্প্রদায়েয় মন জুড়ে রয়েছে?

...নিঃসন্দেহে সমস্তাগুলির অধিকাংশই প্রেম, বিবাহ বা পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত তাই না?—আচ্ছা, একটি পরিবারকে নিয়ে লিখলে কেমন হয়? হ্যাঁ। কিন্তু—লিখি কিভাবে? শেষে যদি লেখাটা আবার মনোনীত না হয়? ধুং, এখন থেকেই ঐসব অলুক্ষণে কথা ভাবতে শুরু করেছি। তবুও—

বিছানা থেকে উঠে সে সামনের ডেস্কে গিয়ে বসল। সবুজ লাইন দেওয়া একটুকরো কাগজ বার ক'রে তার উপর গল্পের নামটা লিখল :

একটি সুখী পরিবার।

বাস্ ঐখানে এসেই তার কলম থেমে গেল। মাথা তুলে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সে ভাবতে লাগল সুখী পরিবারটির পরিবেশটা কেমনধারা হবে।

সে ভাবছিল : “পিকিং? না, না, সে হয় না। ওটা একটা মরা শহর, ওর আবহাওয়াটাও কেমন যেন মৃত ব'লে মনে হয়। পরিবারটির চারদিকঘিরে উঁচু ক'রে একটা প্রাচীর তুলে দিলেও হাওয়াকে আটকানো যাবে না। অতএব—সিউইয়ান, কোয়ানতুং—

*বিখ্যাত চীনা সাহিত্যিক লু হুন-এর A Happy family গল্পটির অনুসরণে রচিত। ঐ গল্পটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

ও জায়গাগুলি কেমন? নাঃ, ওখানে ত' মারামারি হাতাহাতি লেগেই রয়েছে। সাংহাইয়ে বাড়ীভাড়া বড় বেশী। বিদেশের কোন জায়গা বাছলে কেমন হয়? ধ্যাং, সেটা হাঙ্গকর।...ইউনান জায়গাটা কেমন আমি জানি না, কিন্তু সেখানে যানবাহনের অবস্থা খুব খারাপ।”

অনেক ভাবল, অনেক খুঁজল সে, কিন্তু পছন্দসই একটা জায়গা বার করতে পারলে না। শেষে সে ঠিক করল, তার স্ত্রী পবিবার যেখানে থাকবে সে জায়গাটার নাম আপাতত A—বলেই ধরা যাক।

“আচ্ছা তাহলে ওরা A—তেই থাকবে কেমন? ও নিয়ে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। পরিবারটিতে নিশ্চয়ই থাকবে—একটি স্বামী ও তার স্ত্রী। ওরা ভালবেসেই বিয়ে করেছিল—ধরা যাক। ওদের বিয়ের দলিলে চল্লিশটা সর্ভ থাকবে যাতে ক'রে বিবাহিত জীবনে ওরা পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। ওরা খুব শিক্ষিত এবং উচ্চ সমাজের লোক হবে। জাপান-ফেরত হওয়া এখন আর ফ্যাসান নয়, তাই ধ'রে নিলাম ওরা দুজনেই বিলেত ফেরৎ। গৃহস্থানী সবসময় একটি বিলিতী স্মার্ট প'রে থাকে আর ওর কলারটা বরফের মত সাদা। স্ত্রীর চুল পাখীর নীড়ের মত কৌকড়ান, মুক্তোর মত সাদা দাঁত, পরণে কিন্তু তার চীনা বেশবাস.....

“সে কি ক'রে হয়, সে কি ক'রে হয়, এখানে যে পঁচিশ সের* আছে।” জানালার বাইরে, একটি লোকের গলার শব্দ শুনে সে অনিচ্ছানুভবে বাইরের দিকে তাকায়। জানালার পর্দার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো আসছিল, বাইরে কাঠের ঝুড়ি ফেলার শব্দ হচ্ছিল। আবার সে ভাবতে শুরু করল :

‘পঁচিশ সের’ পঁচিশ সের কী?...চুলোয় যাক।

.. আচ্ছা, ওরা খুব মার্জিতরুচির লোক হবে, আটের সম্বাদার হবে। কিন্তু ওরা দু'জনেই খুব স্ত্রী পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে কিনা, তাই রাশিয়ান উপন্যাস ওদের ভাল লাগবে না। অধিকাংশ রাশিয়ান উপন্যাসই নীচুশ্রেণীর লোকদের নিয়ে লেখা, সেটা ওদের পরিবারের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না।...পঁচিশ সের'...ধুক্তোর...আচ্ছা ওরা কি বই পড়বে?...বাইরণের কবিতা? কীটস?...হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে, ওদের দু'জনেরই An Ideal Husband বইটা খুব ভাল লাগবে। অবশ্য আমি এখনও ঐ বইটা পড়ি নি, তবে ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা পর্যন্ত যখন বইটার প্রশংসা করেন, তখন আশা করি ওরা স্বামী-স্ত্রীও বইটা খুব পছন্দ করবে।...

পেটে একটা ক্ষুধার মোচড় অনুভব করছিল সে। দুহাতের উপর মাথাটা ধ'রে (—যেন দুটি অক্ষ-দণ্ডের উপর একটা গ্লোব বসান রয়েছে—)

*যদিও চীনদেশের এক catty-এর ওজন ১৪ পাউণ্ডের কাছাকাছি, অনুবাদের মতগততার জন্ত ওটাকে 'সের' করে দিলাম। গণিতজ্ঞরা আশা করি মার্জনা করবেন।—অনুবাদক।

সে আবার ভাবতে লাগল :

“ধরা যাক, ওরা ছ’জনে এখন লাঞ্চ খেতে বসেছে। একটা বরফ-সাদা টেবিলরূপ দিয়ে টেবিলটা ঢাকা—ঠাকুর খাবার দিয়ে গেল, চীনে খাবার।

...‘পঁচিশ সের’...পঁচিশ সের কি? চুলোয় যাক।...আচ্ছা, ওরা চীনে খাবার খাবে কেন? পশ্চিমের লোকেরা বলে চীনদেশের রীথা নাকি, সবচেয়ে অগ্রসর, রসনা এবং স্বাস্থ্য ছুয়ের পক্ষেই ভাল। অতএব ওরা চীনে খাবারই খাবে, কেমন? প্রথম প্লেট এল, প্লেটে কি কি আছে?...

“জালানী কাঠ...”

চমকে উঠে সে তাকাল, দেখল তার বাঁ পাশে তার নিজের পরিবারের গৃহিণী এসে দাঁড়িয়েছে, দুটো বিষণ্ণ চোখ ওর মুখের উপর নিবন্ধ।

“কী বলছ?” একটু বিরক্ত হয়েই সে জিজ্ঞেস করল।

“জালানী কাঠ ত’ সব ফুরিয়ে গেছে, তাই কিছু কিনছিলাম। এর আগের বার যখন কিনেছিলাম, তখন দশসেরের দাম দিতে হয়েছিল নগদ ছশো চল্লিশ, আর এখন ব্যাটা বলে কিনা ছশো ষাট। ধর, ওকে আমি ছশো পঞ্চাশ ক’রেই দেব।”

“ঠিক আছে, ছশো পঞ্চাশই ধরলাম।”

“ব্যাটা ওজনও কম দেয়। ও বলছে কিছুতেই ওখানে সাড়ে চব্বিশ সেরের কম নেই, ধর আমি ওকে সাড়ে তেইশসেরের দাম দেব।”

“ঠিক আছে, সাড়ে তেইশসেরের দাম দাও।”

“তাহলে...পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচে পনের, আর তোমার...”

হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, তিন পাঁচ পনের, আর...

বেশীদূর এগোতে পারল না সে, কলমটা নিয়ে সেই সবুজ লাইন দেওয়া কাগজটাতে (যার উপরে সে লিখেছে : একটি সুখী পরিবার) একটা অঙ্ক কষল এবং একটু পরে মাথা তুলে বলল : “নগদ পাঁচশো আশি।”

“কিন্তু—আমার কাছেত’ অত পয়সা হবেনা, আশি কি নব্বই কম হবে...”

সে তখন ডেকের ড্রয়ারটা খুলে ওর ভেতর যা পয়সা ছিল সব বার করে স্ত্রীর হাতে দিল। স্ত্রী বেরিয়ে গেল, ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল এবং শেষে আবার ঐ ডেকে এসে বসল। ওর মাথাটা যেনফেটে পড়ছিল। পাঁচ পাঁচে পঁচিশ—আর যত সব আরবী হরফের সংখ্যা মাথার ভিতর কিলবিল করছিল। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সে ওসব মাথা থেকে দূর করে দেবার চেষ্টা করল। একটু হাঁকা বোধ করলে পরে সে আবার ধোঁয়াধোঁয়াভাবে ভাবতে সুরু করল :

“হ্যাঁ প্লেটে কি আছে? এমন একটা কিছু থাকে দরকার যা সাধারণত থাকে না। উঁচু সমাজে ‘ড্র্যাগন আর টাইগার’ নামে একটা খাবার আছে। আমি কিয়াম্শু রেস্টোরার মেহুতে ঐ নাম দেখেছি।...আচ্ছা তাহ’লে ঐ ‘ড্র্যাগন আর টাইগার’ই সই।

“শ্বেটটা টেবিলের মধ্যখানে রাখা হ’ল। ওরা দুজনে একসঙ্গে চপটিক তুলে নিল, একে অত্রের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ক’রে একটু হাসল, তারপর বিদেশী ভাষায় বললে :

‘Chirie sil vous plait !’

‘Voulez-vous commencer, chiri !’

‘Mais nor apris vous !’

তারপর তারা একসঙ্গে একই সাইজের ছটুকরো মাংস তুলে খেতে আরম্ভ করল।... পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তিন পাঁচে...ধুতোর, যতো সব...। ওরা একসঙ্গে খাচ্ছিল ...”

পেছন ফিরে একবার তাকাতে যাচ্ছিল সে, পেছনে অবিরাম ষাওয়া আসার শব্দ হচ্ছিল কিন্তু সে ওর চিন্তার সূত্র ধ’রে এগিয়ে গেল প্রাণপণ অধ্যবসায়ে—

কিরকম গ্রাকামি-গ্রাকামি মনে হচ্ছে, তাই না? হয়ত কোন পরিবারই ঠিক এমনটি ভাবে চলবে না। আমার কল্পনা এত ঘোঁরাটে হচ্ছে কেন?...আচ্ছা, ধরা যাক ওরা বিলেতফেরৎ হবে না, ওরা চীনদেশে থেকেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে। দুজনেই ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট—কৃষ্টিমান্ অভিজাত লোক ওরা।...ছেলেটি লেখক, ধর মেয়েটিও লেখিকা অথবা সাহিত্যরসিক। কিংবা ধরা যাক, মেয়েটি কবি আর ছেলেটি কাব্যরসপিপাসু, অথবা...

আর পারল না সে, পেছন ফিরে তাকাতেই হ’ল তাকে। বইয়ের তাকের পাশেই একগাদা বাঁধাকপি সুপ ক’রে রাখা হচ্ছে, নীচে তিনটি, তার উপর ছুটি, আর চূড়ায় একটি— যেন তার সামনে একটা বিরাট অক্ষর—A

“আঃ।” ওর গালে একটা জ্বালা করছিল, শিরদাঁড়াতে যেন কেমন ব্যথা ব্যথা করছিল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে ভাবতে লাগল :

“সুখী পরিবারটির যে বাড়ী তাতে অনেক ঘর থাকবে। তাতে বাঁধাকপি জাতীয় জিনিষ রাখার জন্য একটা ভাঁড়ার ঘর থাকবে। গৃহস্থামীর পড়বার জন্য একটা আলাদা ঘর রাখা হবে, সেই ঘরের দেয়ালের কাছে অনেকগুলো বই রাখবার তাক থাকবে—সেখানে কিন্তু কোন বাঁধাকপি রাখা চলবে না। তাকগুলি বইতে ভর্তি, কিছু চীনা বই, আর কিছু বিদেশী। তার মধ্যে An Ideal Husband বইটার ছ’কপি নিশ্চয়ই থাকবে। শোয়ার ঘরও একটা আলাদা থাকবে, বিছানার উপর নরম একটা চাদর, বিছানার খাটের নীচটা সবসময় পরিষ্কার ঝকঝকে থাকবে...”

সে একবার নিজের বিছানার নীচটা দেখে নিল। জালানী-কাঠ সব পুড়ে ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটা খড়ের দড়ি মরা সাপের মত কঁচকে পড়ে আছে।

“...সাড়ে তেইশ সের...” তার মনে হল এখনি বুঝি সাড়ে তেইশ সের জালানীকাঠ একটা অফুরন্ত প্রসবণের মত তার বিছানার নীচে এসে পড়বে। সে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করার জন্য উঠে গেল। কিন্তু দরজায় হাত দিয়েই সে ভাবল, তার চেয়ে

বরং দরজার পর্দাটাই ফেলে দিই। তাই করল। পর্দাটাতে ধুলোর একটা পুরু আস্তরণ জমে ছিল।

“...অতএব সেই গৃহস্থামীর পড়ার ঘরের দরজা সব সময় বন্ধ থাকত। কারও কোন কাজ থাকলে সে এসে দরজায় ধাক্কা দিত এবং ভেতরে আসার অনুমতি চাইত। আচ্ছা, ধরা যাক, গৃহস্থামী তার পড়ার ঘরে বসে আছে, এমন সময় তার স্ত্রী তার সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসতে চায়, তাহ’লে তাকেও দরজায় টোকা মেরে আসতে হবে। কিন্তু একটা কথা, স্ত্রী যেন সঙ্গে ক’রে একগাদা বাঁধাকপি না নিয়ে আসে।

—‘Entrez, cherie, Sil vous plait’—

...কিন্তু এমন যদি হয় যে গৃহস্থামীর সাহিত্য আলোচনা করবার সময় নেই, তখন কি হবে? তখন, তার স্ত্রী দরজায় মুহূ টোকা মারছে শুনেও কি সে তাকে উপেক্ষা করবে? না সে নিশ্চয়ই তা করবে না। এ সব হয়ত An Ideal Husband বইটাতে আছে—ওঃ, বইটা সত্যিই চমৎকার হবে। আমি যদি এই গল্পটার জন্ত টাকা পাই, তবে আমি বইটা কিনবই।”

ঠান্ করে একটি চড়ের শব্দ হ’ল। কোনদিকে না তাকিয়ে সে শব্দ হয়ে বসে রইল, কারণ সে জানে চড়টির দাতা তার স্ত্রী এবং গ্রহীতা তার তিন বছরের ছোট মেয়েটি।

“একটি স্মৃতি পরিবারে সন্তানের জন্ম একটু দেরীতেই হবে। অথবা (ছোট মেয়েটির কান্নার শব্দ তার কানে এসে পৌঁছল) হয়ত তার চেয়ে ভাল, কোন সন্তানের বালাই থাকবে না। সেই ভালো...। কেবল ওরা দু’জন...কপোতকপোতী।”

কান্নার শব্দ ক্রমাগতই বাড়ছে দেখে সে উঠে পড়ল এবং পর্দা সরিয়ে যেতে যেতে ভাবছিল: “কার্ল মাক্স বখন তাঁর Das Kapital লেখেন তখনও তাঁর ছেলেপেলেরা চারপাশে কান্নাকাটি করছিল। সত্যিই মহাপুরুষ ছিলেন তিনি...”

পর্দা সরিয়েই সে কেরোসিনের একটা উগ্রগন্ধ অনুভব করল। দরজার কাছেই মেয়েটা উপুড় হয়ে প’ড়ে কাঁদছে। তাকে দেখে আরও একটু বেশীজোরে কাঁদতে শুরু করল।

“আহা-হা কি হয়েছে। কাঁদে না, কাঁদেনা লক্ষ্মীটি।” সে নীচু হয়ে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল। তারপর তাকিয়ে দেখল দরজার বাঁপাশে তার স্ত্রী ভীষণমূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতদুটো এমনভাবে পেছনে করা যেন এখনি শারীরিক ব্যায়ামের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে।

“শেষ পর্যন্ত তুমিও এসে জ্বালাতন শুরু করলে। তোমার দ্বারা ত’ কোন কাজ হবে না, কেবল কাজ বাড়াবে—দেখত’ কেরোসিনের কুপিটা উন্টে গেছে, এখন রাত্রিবেলা কি জ্বালাই?...?”

“কি হয়েছে, কি হয়েছে, কাঁদেনা কাঁদে না।” স্ত্রীর কম্পিত কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে সে মেয়েটাকে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল। আন্তে আন্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বলল: “খুব লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।” মেয়েটাকে দুই হাঁটুর মাঝখানে বসাল। “কৈঁদো না, দেখো, আমি কেমন বেড়াল সাজছি।” বলে সে বেড়ালের অঙ্গভঙ্গী করে মেয়েকে দেখাতে লাগল। মেয়েটা হাসতে হুকু করলে। হঠাৎ সে চোখ ফিরিয়ে দেখল মেয়েটার মুখে হাসি, চোখে জল।

কেমন যেন হয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে হ’ল ঐ হৃন্দর নিষ্পাপ মুখটি যেন পাঁচবছর আগে তার স্ত্রীরই মুখ। বিশেষ করে ঐ টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটো...

সেও শীতকালের এমনি এক উজ্জ্বল প্রভাত যেদিন সে গিয়ে মেয়েটাকে বলেছিল: আমি সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে রাজী তোমার জন্তে,—তোমার জন্তে আমি সব উৎসর্গ করতে পারি—সব। মেয়েটি ঠিক এমনি করেই সেদিন তার দিকে তাকিয়েছিল। ওর মুখে হাসি চোখে জল।...

আচ্ছয়ের মত সে বসে পড়ল, আর ভাবতে লাগল, “আঃ, সেই হৃন্দর ঠোঁটদুটি...”

দরজার পর্দাটা ততক্ষণে দলা পাকিয়ে একদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘরের মধ্যে জালানী কাঠ আনা হচ্ছিল।

সে চমকে উঠে একবার ছোট্ট মেয়েটার দিকে তাকাল। ওর চোখে তখনও জল রয়েছে, টুকটুকে লাল ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক করে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। “ঠোঁট, আহা, ঠোঁট...”

সে পাশ ফিরে একবার তাকাল যেদিকে রাশ রাশ জালানী কাঠ রাখা হচ্ছিল। “আবার সেই পাঁচ পাঁচ পঁচিশ,...এক জোড়া বিষণ্ণ চোখ...”

ভাবতে ভাবতে সে সেই গল্পের নাম-লেখা, অঙ্ক-কথা সবুজ লাইন দেওয়া কাগজটা তুলে দলা পাকাতে লাগল। কাগজটা একবার খুলে মেয়েটার চোখ মুছিয়ে দিয়ে সে বলল: “লক্ষ্মী মেয়ে, যাও, এখন খেলা করোগে যাও।”

পাকানো কাগজটা ওয়েষ্টপেপার বাক্সেটে গিয়ে পড়ল। মেয়েটার জন্ম ওর ছুঁখ হচ্ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, ছোট্ট মেয়েটা আন্তে আন্তে বেরিয়ে যাচ্ছে...কানে জালানীকাঠরাখার শব্দটা বারবার এসে আঘাত করছিল।

চোখ বন্ধ করে সে চুপ করে বসে রইল।

দেখল,...একটা গোল কাল ছিটছিটে ফুল, মাঝখানে তার কমলা রং, যেন বাঁচোখের সামনে দিয়ে গিয়ে আন্তে আন্তে মিলিয়ে গেল...তারপর একটা উজ্জ্বল সবুজ ফুল..... তারপর... তারপর একটা বাঁধকপির সুপ—একটা প্রকাণ্ড অক্ষর, A.

গার্ণিতিক

হরিপ্রসন্ন মান্না—প্রাক্তন ছাত্র

যাঁরা গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নন—তঁারাও এ গল্পের রস গ্রহণে সমর্থ হবেন। স্মৃতরাং মা ভৈঃ।

আমাদের অবনীর কথা বলতে চলেছি। জানেনই তো, 'নিষ্ঠুর' বললে অবনী কাঁদে মেপে মেপে, 'ভাবুক' বললে দাঁত খিঁচোয় বারতিনেক, আর 'মেসিন' বলে গালাগাল দিলে ধন্ববাদ জানিয়ে ডিনারে আমন্ত্রণ করে। জীবনটা তার কাছে এ. পি. কিংবা জি. পি. সিরিজ। দর্শনের ভাবে মতটা মাঝে মাঝে বদলায়, জীবনটা একটা ত্রিকোণ-মিতি—বৃত্তি নীড় নারী তার পরিমাপ।

অবনী নেহাৎ বেচারী—বাবা তাকে বৃত্তির চিন্তা করতেই দিলেন না। হঠাৎ মারা গেলেন—অবনীর কাঁধে চাপিয়ে গেলেন ফলাও ব্যবসাখানা; জগদল পাথরের মতো শক্ত তা'—গ্র্যাভিটেশনের জোরে অবনীর পাগলা গতি সংযত হ'ল অনেক। আর নীড়? 'কুঞ্জ-ভিলা' শুধু নীড়ই নয়, প্রাসাদও বটে, অবনী ও তন্ত্র পুত্রপৌত্রাদি বর্তমান থাকলে আর অদূর ভবিষ্যতে একটা প্রাকৃতিক দুর্ধোগ দেখা না দিলে, ওটাও অটল রইবে।

বাকী রইল—নারী। অবনীর ফরমুলা অপূর্ণ রয়ে গেছে আজও। যোগাযোগটা ঘটিয়ে উঠতে পারেনি সে। কিন্তু কেন? সে প্রশ্নের উত্তর অবনী এককথায় দেয়নি। তাইতো এই গল্পের অবতারণা।

বেঁচে থাকতে মার সে কি অলুন্নয়, অলুরোধ ও অভিযোগ—অবন, উপযুক্ত পুত্র হয়ে বুড়ো বয়সে মাকে বউ দেখাতে পারলিনে?

কি যে বউ বউ কর। আজকালকার বউ যেন ইয়ে.....। আমতা আমতা করেই সেরেছে অবনী।

কিন্তু অবনী বোঝে—হাড়ে হাড়েই বোঝে। একজনের অভাবে জামা জুতো ছাতা থেকে ভাত তরকারী ভাল, আর তার থেকে টাকা আনা পাই—সব যেন কেমন গুলিয়ে দেয়। হৃদয় বলে জিনিষটাও অবনীর কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে বিশেষ কোন মুহূর্তে। ভারী বোঝাই মনে হয় মাঝে মাঝে। ডেবিট ক্রেডিটের কালিমাখা শুঁড়িপথে প্রেমের ঘুলঘুলি থাকবেনা, সেই বা কেমন!

অবনীর ব্যবসার বিরাটস্ব আমার জানা নেই, তবে সে যে পাকা ব্যবসায়ীর সন্তান তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এখানেই যতো গুণগোল। সে জানে, ভালো করেই জানে, পৃথিবীতে সে যাকে পারে একস্প্লয়েট করেছে। 'ঠকানো' শব্দটা অবনী ব্যবহার করে না—ওটা অনাৰ্ধ।

বিয়ের জন্তে কি সে চেষ্টা করেনি? যথেষ্ট করছে। কিন্তু ঐ যে ব্যবসাদারি চাল। বাজে মাল গছিয়ে নিজের প্রফিট সেন্টপারসেন্ট মেরে দেওয়া। অপরের কপাল ভেঙে নিজের আখের গোছানো। বিয়ের বাজারে এ পুরোমাত্রায় গাষ্টি—গুকারজনক।

দশটি বছর চূপচাপ। মা মারা গেলেন বউ বউ করে, তবুও। ফাট্কাবাজার আর সংসার যদি একই হলো তাহলে আর নতুন করে হাঙ্গামা পোয়ানো কেন?

সেদিনের কথা ভাবলে অবনী শিউরে ওঠে। কতবড় রিস্ক্ই না সে নিতে চলেছিলো।

২

দশ বছর পেছনের টাটকা সকাল। গ্রীষ্মের হলেও কেমন যেনো বাসন্তী ছোপ লাগানো। অবনীর মনটা স্মৃতিতে ফেনিল। একটা অকাল-মধুমক্ষিকা নেচে নেচে যেনো 'নয়' সংখ্যাটির পরে হাজার হাজার শূণ্য জুড়ে নিচ্ছে।

মাগের সনির্বন্ধ অল্পরোধে মাসতুতো দাদা রামতারণের সঙ্গে অবনী চলেছে পাত্রী দেখতে। 'দুর্গা দুর্গা!' মা হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে।

ধুতি পাঞ্জাবিতে একটা মিষ্টি গন্ধ। আশেপাশের বাতাস বয়ে যার নাকে ঢোকে, সেই-ই অবনীর আন্দোৎফুল্ল মুখখানা দেখে নেয়।

আজই যেনো তোর বিয়েরে অবন। রামতারণ ঠাটা করে।

অবনী সপ্রতিভ জবাব দেয়। এবারকার পাত্রী আর ফস্কে যাবেনা, দেখো।

যা যা চাই, সেই রকমই তো লিখেছে।

পকেট থেকে বের করে একটা খবরের কাগজের কাটিং। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বাস্থ্যব.....। টেনে টেনে পড়ে অবনী।

নে নে রাখ, সবটাইতেই ও রকম লেখা থাকে।

রামতারণের দাবড়ানিতে অবনী চূপ করে যায়। অভিজ্ঞতা আছে রামতারণের। হু' হুটো বিয়ে।

ট্রাম থেকে নেমেই, বেশী খুঁজতে হয় না। সামনেই রাস্তাটা। মোড় ফিরতেই চায়ের দোকান। এক ছোকরা বেরিয়ে আসে। লম্বা দোহারি ফর্সা চেহার।। ভদ্র অথচ ময়লা ময়লা, হয়তো স্কুল ফাইনালে ফেলকরা বখাটে ছোকরা। হয়তো বা, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র।

শুধুন।

রামতারণ আর অবনীর সামনে দাঁড়ায়।

সাতের-ই তে যাচ্ছেন তো? পাত্রী দেখতে?

কানের কাছে মুখ আনে। ফিস্ফিসানির অন্তর থেকে কটা কথা উদ্ধার করে অবনী। গোপন তথ্য। নেহাৎ শুভানুধ্যায়ী বলে জানাচ্ছে। মেয়েটা যে খোঁড়া ?

খোঁজ নিয়েছেন ভাল করে ? সতর্ক মঙ্গলাকাজ্ঞা।

অবনীর গায়ের মিষ্টি গন্ধটা ক্রোরোফর্মের মতো তার চেতনাকে চেপে বসে। তার উৎসাহের বৃত্তটা ক্রমশঃ ছোট হ'তে হ'তে বিন্দুতে মিলিয়ে যায়।

খোঁ-খোঁ-ডু-ডা, তাহ'লে যে লিখেছে নিখুঁত গঠ.....। পকেটে হাত দিয়ে কাটিংটা অল্পভব করে। সলিড্ প্রফ।

রামতারণ বোবা মেরে যায়। ছোকরাই আবার কথা বলে। যাচ্ছেন যান। আমার কথা শুনবেন কেন মশাই ? যাচাই করে দেখে নিন। তবে 'ঠকবেন' না যেন ?

ঐ অনার্থ্য শব্দটার প্রয়োগে অবনী ইলেকট্রিক শক খায়।

ধন্যবাদ। নমস্কার। অবনীর হাত ধরে রামতারণ হন হন করে এগিয়ে যায়। যতো সব বখাটে !

শিবনাথ বাবু অমায়িক ভদ্রলোক। কথাদায়ের ভারে অস্বাভাবিক বিনয়ী। আদর আপ্যায়নে পযুঁদন্ত তারা ছ'জন—অবনী আর রামতারণ।

এবার মেয়ে দেখানোর কাজটা সেরে নিন। আমাদের ইয়ে বড় দেবী হয়ে যাচ্ছে। রামতারণ তাড়া দেয়।

এই যে এই হল বলে। শিবনাথবাবু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আপনারা তাহ'লে একটু গাজ্রোখান করুন। শিবনাথবাবু অন্দরের দরজায় দাঁড়িয়ে আহ্বান জানান।

রামতারণও অবাক। অবনীও অবাক। এ'ওর দিকে তাকায়। অন্দরে গিয়ে মেয়ে দেখতে হবে। এ কেমন নিয়ম।

অবনী চিম্টি কাটে। কানের কাছে হিস্ হিস্ করে। রামুদা, মেয়ে নিশ্চয়ই..... রামতারণ সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকায়, মেয়েটি মুখ নীচু করে বসে। হাত তুলে নমস্কার জানায়।

প্রাথমিক প্রশ্নোত্তরের পালা। ছ'একটা মামুলি প্রশ্নের পর হঠাৎ অভব্য প্রশ্নাব। রামতারণের গলায় দৃঢ়সঙ্কল্পের আভাস।

অবনী চমকে যায়। ভাবছিল, পাড়ার ছেলেটা হিংসেয় বদনাম রটিয়েছে। বেশ স্ত্রী দেখতে মেয়েটি। স্বাস্থ্য ভালই। পা'র পাতা ছুটি বেশ সুগঠিত। পোড়া নয়, বাঁকা নয়, ত্যাড়া নয়।

রামতারণ প্রশ্নাব করে, আপনি এবার একটু হাঁটুন তো।

অবনী ফ্যালফ্যালিয়ে তাকায়। শিবনাথবাবু ভুরু কঁচকান। অপ্রস্তুত কিংবা অপমানিত। পাত্রী বাঁ পা'টা একটু টেনে টেনে সোজা অন্দরের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রামতারণ অবনীর হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তোলে। শিবনাথবাবু হাঁ হাঁ করে ওঠেন। আঘাত টাংগাত লেগে থাকবে নিশ্চয়ই, কই আজ সকাল পর্যন্ত তো……কথা আর শেষ হয় না। অবনীর কর্ণস্বর শোনা যায়, বেশ চড়া আর ব্যবসাদারি মেজাজের। যান্ মশাই ওসব 'ঠক্বাজি' আমাদের কাছে চলবে না।

মাথার ঠিক থাকেনা তার। অনাৰ্য্য ভাষাতেই চেষ্টায়ে উঠল, জীবনে এই প্রথম। সমস্ত পৃথিবীর হিসেবের খাতার গোলাগুলো সেদিন মুখ বেঁকিয়ে অবনীকে ব্যঙ্গ করেছে। দশ বছরের পুরোনো কালি আজো দগ্ধগে রয়েছে সারা খাতা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড মাইনাস্ চিহ্ন ঐকে।

৩

অফিসে ঢুকতে ঢুকতে অবনী হাতঘড়িটা দেখে। ইস, বড্ডো দেবী হয়ে গেল। দশটা কখন বেজে গেছে! মিনিটের কাঁটা এ্যাকিউট এ্যাপ্লেটাকে অব্টিউসে টেনে নিয়ে চলেছে।

গিরুধারী, বুরবক্ কাঁহাকার। একাধারে ভৃত্য-গৃহিণী-পাচক শ্রীগিরিধারীলালের উদ্দেশ্যে ব্যাচিলর অবনী স্বগতোক্তি করে।

ছোকরা কেরাণী শ্রামাপদ ছোট্ট করে মাথা নোয়ায়। নমস্কার শ্রার, আজ একটু দেবী…… অবনী তাকে ইসারায় ডাকে। কাঠের হাফ-দরজায় মাথা গলিয়ে বলে শ্রামাপদ, ডাকছিলেন কেন, শ্রার ?

একটা নোট নাও দেখি। আমাদের অফিসের জন্ম স্ত্রী শিক্ষিতা অবিবাহিতা তরুণী আবশ্বক—পার্সোন্সাল এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। হয়েছে ?

শ্রামাপদ ঘাড় নাড়ে।

এই মর্মে আজই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও।

শ্রামাপদ মাথা চুলকোয়। শ্রার, একটা কথা। ঐ ক্লজটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। মানে ঐ অবিবাহিতা……

অবনীর ধাতব কর্ণস্বরে নিজের নামটা উচ্চারিত হতে দেখে আমতা আমতা করে করে শ্রামাপদ সরে পড়ে।

অবনীর মাথায় বিয়ে-করার এই প্ল্যানটা হঠাৎ এসে গেল 'ম্যাথামেটিক্যাল স্কুল অব্ ফিলান্থ পি'র মাসুলি জার্নালখানা উর্টেতে উর্টেতে। দেখাই যাকনা কদ্দুরের জল কদ্দুর গড়ায়।

টাওয়্য হয়েছে স্ত্রী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী। জোটে বহু অনাকাজিফতা। রূপ আর শ্রীতে দেউলে প্রায় সকলেই।

অবনী মুখের ওপরই বলে দেয়। বিজ্ঞাপনটা ভাল করে পড়েছেন? আঙ্গুল দিয়ে লাইনগুলো নির্দেশ করে। এর কোন্টা আপনার আছে?

নেক্‌স্ট।

শ্রামাপদ কাঠের দরজার বাইরে। পাঠিয়ে দিচ্ছি আর।

অচলাকে দেখেই চিনতে পারে অবনী।

অবনীর আটাশ ছিল তখন। আরও দশটা শীত-বসন্ত উৎপাত করে গিয়েছে তারপরে। কিন্তু অচলার বেলায় মনে হয় দশটা বসন্ত তেমনই জমা রয়েছে, দশটা শীতের দু'একটা আঁচড়-চিহ্ন পড়েছে শুধু।

বেশ, সোজা সর্টান হেঁটে এল অচলা। দশ বছর আগেকার সেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা মেয়েটার সঙ্গে মেলাতে পারেনা অবনী।

বসতে পারি?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। চেয়ারটা দেখিয়ে দেয় অবনী।

প্রথম প্রশ্ন আসে অবনীর দিক থেকে। একটা অঙ্কের এদিক-ওদিকের ওপর বিরাট একটা লাভক্ষতির খুঁকি নিয়েছে সে।

আপনি তো খুঁড়িয়ে হাঁটছেন না?

মেয়েটি এড়িয়ে যায় প্রশ্নটা। চিনতে পেরেছেন দেখছি। জাভঙ্কি করে। ভালই হল। চাকরিটা তাহ'লে লেগেই যাবে, খোদকর্তা যখন চেনা।

অবনী হিসেব মেলাবেই।

সত্যি সত্যি সাময়িক চোট লেগেছিল তাহ'লে? এখন দেখছি একদম সেরে গিয়েছেন। সহজ হতে চেষ্টা করে অবনী। তার পরিপূর্ণ দৃষ্টির সহজ চাহনি অচলার নত মাথার সাদা সীথির পথ ধরে গহন অলকরাশিতে হারিয়ে যায়।

গম্ভীর কণ্ঠে অচলা জবাব দেয়। কোনকালেই খোঁড়া ছিলাম না। আঘাত ও লাগেনি কোন দিন। সেদিনও না।

তাহ'লে! অবনী বিস্মিত। ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। খুখুগুলো শক্ত পাথরের মতো গলার পথ জুড়ে।

অচলা দৃঢ়স্বরে বিস্মিত অবনীকে বিস্মিততর করে জানিয়ে দেয় বিজ্ঞাপনের ফিরিস্তি অল্পযায়ী মিলিয়ে তাকে দেখে নেওয়া হক। যদি তাকে দিয়ে কাজ চলে তবে অল্পগ্রহ করে চাকরিতে বহাল করলে সে খুশী হবে।

স্পর্ধাতো কম নয়। অবনীর মেজাজের মার্কারী চড়ে যায়।

নেক্‌স্ট। এই একটি মাত্র বিদেশী শব্দের রুঢ় উচ্চারণে অবনী তাকে নমস্কার জানায়।

নিজের ওপর আস্থা ক্রমশঃ হারাতে বসে অবনী। পাত্র হিসেবে সে কি অপছন্দের? তবে?

ব্যালাঙ্গশীট নতুন করে লিখতে হবে। অবনীর ম্যাথামেটিক্যাল স্কুল তাকে বুদ্ধি দিলে, অচলাকেই মনোনীত কর : নো রিঙ্ক নো গেইন্।

8

অচলার কাজকর্মে কোনরূপ ত্রুটি নেই। কিইবা কাজকর্ম। কয়েকটা চিঠি ডিক্টেট করে দেয় অবনী। অচলা তাই লিখে নেয়। রোজকার ডাক খোলে। অদরকারী বাতিল করে কিংবা কম দরকারীর উত্তর নিজেই লেখে। বেশী দরকারী অবনীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। ব্যস্!

সারা প্ল্যানটাই কি রকম যেন ইম্ব্যালেন্সড্ মনে হয় অবনীর। পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্টের কি দরকার ছিল তার? ছোট ফার্মের জন্ম শ্রামাপদরাই যথেষ্ট। গিব্বারীদের দিয়ে যে কাজ চলে না, সেই কাজের সহায় চেয়েছিল সে। জীবনের সহযোগী। কর্মের নয়।

কয়েকদিন পরেই অচলা এক চিঠি পাঠায়। ব্যক্তিগত নয়। ছুটির দরখাস্ত। এক-মাস কাজ হয় নি, এর মধ্যেই? শরীর অস্বস্থ, কি আর করবে। অবনী বিবেচনা করে।

ছুটা তো মঞ্জুর করলই, সেই সঙ্গে আরও একটা কাজ করলে অবনী। যাতে করে কেমন যেন খটকা লাগে শ্রামাপদের মনে।

অচলা ঘোষের ঠিকানাটা দিতে পার হে, শ্রামাপদ? অফিসের ফাইলেই তো পাওয়া যাবে, না? অবনীর জিজ্ঞাস্য দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে কটি কথা মরীয়া হয়ে ছুঁড়ে দেয় শ্রামাপদ। ডাক্তার নিয়ে যাবেন বুঝি?

অবনী ফেটে পড়ে না। কেমন যেন খতমত হয়ে যায়। শ্রামাপদের সাহস বাড়ে। অবনীর উত্তরটা অজুহাতের মত শোনায়।

না ঠিক ডাক্তার নয়, তবে কিনা মিস্ ঘোষের সঙ্গে অনেকদিনের চেনা, সেইজন্তে.....

তাতে বুঝিই স্মার। শ্রামাপদ বিগলিত হয়ে পড়ে। না হলে কি আর অবনী ইন্টারভিউ এর দিন প্রথমেই স্বাস্থ্যের প্রশ্ন করে অচলাকে। কার্টের পার্টিশনের বাইরেও কথা শোনা যায়। কান পাতলে বিশেষ করে।

বোঝ, কি বোঝ? রুট প্রশ্নে শ্রামাপদ খাপড় খায় যেন।

সত্যি কথা বলতে কি অবনী নিজেই ব্যাপারটা বোঝেনা। সেই জন্তেই না এই অফিস ফেরত ক্লাস্তি নিয়ে সে চলেছে অচলার ঠিকানায়।

দশ বছর আগেকার দেখা সেই জায়গাটা নয়। না বাড়ীটা, না রাস্তাটা, সব কেমন নতুন ঠেকে অবনীর কাছে।

সদর দরজায় ছোট একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। বছর পাঁচ ছয়েকের। অচলার মতই দেখতে।

শিবনাথবাবুর কনিষ্ঠ বৃষ্টি ।

অবনী জিজ্ঞেস করে । হ্যাঁ খোকা, তোমার দিদির অস্থখ করেছে, না? তাঁকে বলগে অবনীবাবু এসেছেন ।

দিদি? দিদিতো আমার নেই । আমি একলা । খোকা জানিয়ে দেয় অবনীকে সে আর তার বাবা মা, এই তিনজন মোট তাদের সংসারে । অস্থখ হয়েছে তার বাবার, মায়ের নয় ।

অবনী হঠাৎ শূণ্ণে বোঁ বোঁ করে উড়তে আরম্ভ করে । আকাশটা নীল নয়, কালো । কানের ছুঁপাশের শিরা ছুঁটো মোটা হয়ে ওঠে, দপ দপ করতে শুরু করে ।

পথের ধারের পুকুরে দামাল ছেলেরা টিল ছুঁড়ে ব্যাঙদের অস্থির করেছিল । এই রকমই যেন গল্লে আছে । অবনীর চোখেমুখেও শক্ত পাথরের চোট লাগে,—খোকাক কথা-গুলো আধো-আধো হলেও বেশ কঠিন ।

অচলা হাজির । তুই এখানে আর আমি সারাবাড়ি…… । মার স্নেহোদ্বেল কণ্ঠস্বর সহসা আর্ত হয়ে ওঠে । ভূত দেখেছে যেন অচলা । পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মতো অচলার ঠোঁটছুঁটো খালি নড়ে ।

আ-পনি এখানে ?

অবনী হাসে । শুকনো হাসি । যোগ-বিয়োগে মস্ত ফাঁকি ধরে ফেলেছে যে । শুধু এই গৌরবের প্রলেপ দিয়েই ক্ষতির ব্যাথাটা ঢেকে দেয় অবনী ।

চলুন, আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে আসি ।

অবনীর উচ্চারণ ভঙ্গী চেষ্টা করলেও স্বাভাবিক হয় না । অচলা সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারে ।

অবনী খনিজ পদার্থের কারবার করে । মাটির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অজ্ঞাত বস্তু বিশ্বয় জড়িয়ে পড়ে থাকে । অবনী তা' জানে, সেটা উদ্ধার করাই তার কাজ । কিন্তু এতটা সে আশা করেনি ।

অচলার স্বামীর ইনফুয়েঞ্জা হয়েছে । ভদ্রলোক জরে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন । তাই অচলা ছুটা নিয়েছে । ইত্যাদি বলে অচলা অবনীর সঙ্গে রমেনের আলাপ করিয়ে দেয় ।

সেই লম্বা দোহারী ফর্সা চেহারা । ফিস্ ফিস্ করে সেই ক'টি কথা—‘মেয়েটা যে খোঁড়া ।’

অবনী বেশীক্ষণ টিকতে পারে না । পালিয়েই আসে বলতে গেলে । জিভের উগায় চিনি-কম-দেওয়া চায়ের কটুস্বাদটা তখনও মিলিয়ে যায়-নি ।

আজ অচলার সাদা সীমস্তের ছলনা খরধার রূপাণের মতো অবনীর নির্ভরতা ও বিশ্বাসের মূলে ক্রুর আঘাত হেনেছে । কাগজের কাটিংএর পাত্রী । তাই দেখতে গিয়ে তার এতদিনকার জমা খরচের নথিপত্র তছনছ হয়ে যাবে, তা' সে ভাবেওনি কোনদিন ।

একজনের টাকা আর একজনের পকেটে যাবে। ব্যবসারই নিয়ম। একজনের বঞ্চিত সম্পদ নিয়েই আর একজনের তহবিল স্ফীত। আশ্চর্যের কিছুই নাই। তবু ব্যবসাদার অবনীর অন্তরটা, কেন জানিনা, একটা সূক্ষ্ম ব্যথা অহুভব করে।

সঙ্কোচেরই কথা। অচলা বেশ ভয়ে ভয়েই কাজে যোগ দেয়। বলেও ফেলে অবনীকে। খানিকটা ঠাট্টার ছলে। বিয়ে করে ফেলেছি—এটাই আমার ডিম্-কোয়ালিফিকেশন। আর সবতো ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছে। কাজের তো কোন অস্থবিধে হচ্ছে না? ক্ষমা করে দিন।

অবনী ক্ষমা না করে পারে না। হো হো করে হেসে ওঠে। লঘু করে দেয় ব্যাপারটাকে। অচলা বোঝে অবনীর রাগ নেই। নিশ্চিত হয় না জেনেই যে অবনীর বেশ ক্ষতি হয়েছে।

মিস্ বোষ। অবনী ডাকে ছুটির পরেই। শাড়ির প্রান্তটা পার্টিশনের ওধারে অদৃশ্য হয় হয়। অবনী ছুটে গিয়ে পথরোধ করে।

শ্রামাপদের দৃষ্টি অগ্রাণ্ড করানীর নিরীহ মুখগুলোর ওপর একটা অর্থপূর্ণ পরিক্রমা দিয়ে নেয়।

অচলা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। অবনী চাকরী দেবে। রমেনকে। টাইপিটের কাজ। অচলাই বলেছে। কাজ করত রমেন টাইপিটের। এক মার্চেন্ট অফিসে। এখন বেকার। জানেনইতো প্রাইভেট চাকরির অবস্থা? যেন পদ্মপত্রে নৌর।

উস্কৃসিত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় অচলা। অবনী লোকটা পরোপকারী। নিঃস্বার্থ।

অনেক অজ্ঞাত অকারণ বেদনার কারণ হয়েছে আমি। আপনার মনটা পরিষ্কার দেখতে পাই। অচলা আজ ফেনিল হয়ে ওঠে। কথাগুলো সত্যি। অবনী ও অচলা দু'জনেই বোঝে।

রমেনের চেয়ার বসল মালিকের ঘরের পাশেই। পার্টিশনের এধার ওধার। ঠকাঠক্ টাইপ করে যায় রমেন।

কাঠের ঘরের ভেতর এককোণে অচলার চেয়ার। চিঠি খোলে। পড়ে। উত্তর লেখে। রমেনের কাছে পাঠিয়ে দেয় টাইপের জন্তে। দরকার হলে ডাকে অবনী। ডিক্টেশন দেয়। কাজ না থাকলে নভেল পড়ে অচলা।

অচলা-আ-আ। মিষ্টি ডাক দেয় অবনী।

পার্টিশনের বাইরে শোনা যায় কখনও কখনও অবনীর কণ্ঠস্বর। আজকাল আর 'মিস্ বোষ' ডাকে না। তুমি বলেই সঘোষন করে। ব্যক্তিগত নিছক ব্যবসা-ছাড়া কথাও বলে মাঝে মাঝে।

বাইরে টাইপরাইটারের ঠকাঠক্ থেমে যায় সহসা।

অচলা—একবার নিউমার্কেটে যাবে?—এই কয়েকটা স্মার্ট করাব। কালার-চয়েসের

ভারটা তুমি নিলে মন্দ হতনা। জানই তো জীবনটা আমার একলার। অবনী অহেতুক জোরে হেসে ওঠে প্রাণখোলা হাসি।

অচলাও রিনরিনিয়ে ওঠে। শুষ্ক জীবন বেচারার। গজল সহানুভূতিতে উপচে পড়ে সে।

অবনী হঠাৎ খাতাটা টেনে নিয়ে ডুব দেয় হিসেব ঠিক মেলাবার সমুদ্রে। বলে, তাহলে এই কথাই রইল। ছুটির পর আমার সঙ্গে যাচ্ছ।

হ্যাঁ, একটা কথা, রমেনের অল্পমতি নিতে ভুলোনা। অবনী যেন শুধু ব্ল্যাঙ্কেট কেটে স্বস্তি পায় না, তাই এছেন সতর্কতা।

টাইপরাইটারটা আবার 'ঠকাঠক্' 'ঠকাঠক্' চলতে শুরু করে। তাল আর গতিটা অসম আর দ্রুততর।

অবনী মুখে মুখে উত্তর বার করে। মানসাক্ষের মতো। একটা ক্রুর দৃষ্টি এতক্ষণ আটকে ছিল পার্টিশনের গায়ে। একটা দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অল্পভূতি এতক্ষণ ভাসাভাসা কথা ও উচ্চকিত হাসির বিশেষ অর্থের গহন অরণ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা বিশেষ মনের সমস্ত ভাবনাই এখন উন্নত গতিতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে টাইপমেশিনটাকে। ঠকাঠক্ ঠকাঠক্.....।

জীবনটা এমনিই

বন্দনা রায়—ষষ্ঠ বর্ষ, কলা

শতাব্দী সেন আপনিও হ'তে পারেন, আমিও হ'তে পারি। তার অভিজ্ঞতা সব নেহাংই এখানে ওখানে অর্জিত। ধ্যানযোগে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি তার হয় নি, মাইনাস ফোরের মোটা কাঁচের ভেতর দিয়ে জগৎটা তার কাছে ঠিক যেমন, তেমনি। নিছক বস্তুর সমাবেশ আর কি, আর তারই পটভূমিকায় কতগুলি বিদ্যুটে প্রাণের সামঞ্জস্যহীন ঘোরাঘুরি। বস্তুর সঙ্গে প্রাণের একটা নতুন theory of relativity বার করে মোটেই প্লুতিকিত নয় শতাব্দী সেন। কারণ, ও দেখেছে এই সম্বন্ধবোধে দুই এর সঙ্গে দুই যোগ করলে সব সময়ই পাঁচ হয়ে যায় আর ওর স্থান বরাবর দাঁড়ায় সেই 'একুশ্রী' একের মধ্যে। যেমন ধরুন না।

পরীক্ষা হচ্ছিল। নিস্তরক ঘর, কতগুলি নীচু মাথা এবং মাঝে মাঝে পাতা উন্টানর খসখসে আওয়াজ। চল্লিশকে যদি মোটামুটীভাবে জীবনের মধ্যাহ্ন বলে ধরা যায় তো এখানকার পরীক্ষার্থীদের এখন দশটা বেজেছে। অর্থাৎ নেহাং ছেলেছোকরা নয়। চাকরী করতে করতে পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় পাশ করে আরও ভাল চাকরী। নিবিষ্ট মাথাগুলি লক্ষ্য করলে

দেখা যাবে কারোও রগের চুলে পাক ধরেছে, কারও বা পাংলা হয়ে এসেছে মাথার মাঝামাঝি। বলুন, এ হেন মার্কারার ভদ্রলোকদের কাউকে যদি দেখা যায় অনবরত একটা কাগজ পকেট থেকে বার করছেন, দেখছেন এবং লিখছেন, মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে? শতাব্দী সেনের নাগরিকতাবোধ খোঁচা মারল। বেঞ্চের এ কোণে ও নিজে, মধ্যে কয়েকজনকে বাদ দিয়ে আরেক কোণে সেই ভদ্রলোক। “ওপারেতে উপবনে” অত খেলা দেখবার পরও “এপারেতে ধুঁ মরু” কখনও চুপ থাকতে পারে? গার্ডকে ডাকা হ’ল—“স্মার, ডিস্টারব্যান্স হচ্ছে, পাশে বসে এমন টোকাটুকি করলে আমরা ঠাণ্ডা মাথায় লিখি কি করে বলুন?” আশ্চর্য—শ্রীমান এখনও হাতে কাগজখানি নিয়ে তির্থ্যক হাসি হাসছে। গার্ড এগিয়ে গেলেন। একই সঙ্গে প্রায় গার্ডের দিকে এগিয়ে এল শ্রীমানের কাগজসমেত হাতখানি। আর এগিয়ে এল জোড়া জোড়া উৎস্বক চোখ। ওমা! কাগজ তো নয়, এ যে একটা ফটো! সুন্দরী মহিলার নয়নমনোহর হাসি। “আমার ফিঁয়াসে, স্মার ছবিটা না দেখলে inspiration আসে না, লিখতেও পারি না এক বর্ণ!”—দেখুন, দুই আর দুই—একটি কোয়ার্টার মাপের ছবি এবং একটি পূর্ণ বিকশিত নির্লজ্জ হৃদয় কি ভাবে যুক্ত হয়ে গেল, আর যোগফল পাঁচের ‘একট্রা এক’ শতাব্দী সেন রক্তবর্ণ মুখে তার খাতার রচনার অসম্পূর্ণ বাক্যটি শেষ করল—that ‘age and modesty should go hand in hand’ were the last words of Lord Buddha.

এই তো গেল ফটো। তারপর ধরুন ওভারকোট। সেটা আবার দার্জিলিংএ। ‘flu’ এর প্রকোপ এড়াতে গিয়ে শৈলশিখরে দিনগুলি নেহাত মন্দ কাটাচ্ছিল না শতাব্দী সেন। হঠাৎ ওর তিন বন্ধুর মূর্তি ধরে ছুঁত্যাগ্য স্বয়ং এসে হাজির হ’ল। এতদিনে পাহাড়ের কুয়াশা আর শতাব্দী সেনের গায়ের কষল একইভাবে অনড় ছিল। এবার দ্বিতীয়টার টান পড়ল। চল বার্ষিক হিলে বনভোজনে। কিসে, না ষোড়ায় চেপে। ও-ও যাবেনা, ওরাও ছাড়বেনা। শতাব্দী সেনের নিজের ওজনের সঙ্গে ওভারকোটটার ওজন যোগ করলে পাহাড়ে ধব্দু নেমে যায়, ষোড়া তো তুচ্ছ। প্রথমে তো বেশ চলল, তারপর পঁচমিনিট যায় তো দু’মিনিট থামে। একে অভিজ্ঞতা নেই, তার ওপর চোখের সামনে বন্ধুরা দিব্যি এগিয়ে চলেছে। এমন অবস্থায় শতাব্দী সেনের ষোড়া হাঁটুর গুঁতো খেয়ে শেষকালে দেখল পথের ধারে ঘাস। আর কি, নীচে স্থিতি, উপরে প্রলয়। নীচে ভোজনরত অশ্বিনীকুমার, উপরে ক্রোধকম্পিত শতাব্দী সেন। এদিকে হিমালয়ও শতাব্দী সেনকে দেখেই বোধহয় অনুপ্রেরণা পেয়ে খুলে ফেলেছে কুয়াশার চাদর। রোদ জ্বল জ্বল চারদিক। আটহাজার ফিটের গুরুত্বকেও উপেক্ষা করে সে রোদ ঘামিয়ে দিল শতাব্দী সেনের ওভারকোটপরা দেহ। সে না কি এক দৃশ্য! ওর বন্ধুরা পরে বলেছিল। তারা পিছন ফিরে ওকে দেখতে না পেয়ে ফিরে আসছিল। মাঝ রাস্তায় দেখা মিলল ঘর্মাক্তকলেবর বন্ধুর। ছুঁটো হাতই লাগাম ধরতে লেগেছে, তৃতীয় একটা না থাকায় কোটটা খোলা সম্ভব হয় নি। ওর ষোড়া নিবিষ্ট

হয়ে ঘাস খাচ্ছে, ঘড়ি মেলালে—পনের মিনিট ধরে তো হবেই। এবং দূরে একটি আমেরিকান ট্যুরিষ্ট ক্যামেরা বাগিয়ে হাসছেন, সঙ্গিনী অঙ্কদিকে মুখ ফিরিয়ে। ওরা বলে সাহেবটি তাঁর ক্যামেরার দুর্ক্যবহারের নিদর্শন স্বরূপ সেই ছবির একটি কপি পরে ওদের হোটেলে দিয়ে এসেছিলেন। শতাব্দী সেন অবশ্য বিশ্বাস করে না, কারণ সে ঘটনা প্রত্যক্ষ না করেই বিকেলের ট্রেনে ও ক’লকাতায় ফিরে এসেছিল। কি বলব, সেদিন থেকে বেচারী কোট ছেড়ে শাল ধরেছে, আর নিজের ক্যামেরাটা এক তৃতীয়াংশ মূল্যে দিয়েছে বিক্রী করে।

তার উপর আবার এই ঘটনা। এবার বস্ত্র স্থানে চশমা এবং প্রাণধারিণী এক স্বেশা, স্ত্রী তরুণী। শতাব্দী সেন চলেছিল নতুনকেনা মোটর সাইকেলে, রাসবিহারী এ্যাভেন্যু ধরে। ঠিক পাশেই চলছিল একটা দোতলা বাস। সবে স্পীড নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে, এমন সময় বন্ধ দেশে মুহূ আঘাতে চমকে শতাব্দী সেন ব্রেক কষলে। ব্যাপারটা বুঝতে মিনিট দু’এক লাগল, তারপর দেখল চশমা। আরও দেখল, কিছুদূর গিয়ে বাসটা থেমে গেছে। তার দোতলার জালনার পুঞ্জ পুঞ্জ মাথার ভীড়, একতলাটা খালি। একতলার যাত্রীদের নীচে নামিয়ে শুল্ল আসনগুলি তোলপার করে চশমা খুঁজছেন কণ্ঠকটরঘর এবং এক তরুণী। বৃদ্ধির একটা টেউ এল শতাব্দী সেনের মস্তিষ্কের বালুবেলায়। ওরা যখন খোঁজাঝুঁজি করে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে ঠিক তখনই চশমা সমেত হাতখানি বাসের জালনা দিয়ে বাড়িয়ে দিল শতাব্দী সেন—“এই যে।” চশমাটি হাতে নিয়ে উদ্ভাসিত মুখে চকিত ভঙ্গীতে নেমে এল মেয়েটি, বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানাতে।—“ইস্, এমন ভীড়, কার বা হাতে লেগে পড়বি তো পড় একেবারে জানলার বাইরে? আর আমি সারা বাস খুঁজে মরছি! ভাগ্যিস আপনি ধরেছিলেন! অনেক, অনেক ধন্যবাদ!” কথা বলা নয় তো যেন শিখ ড্রাইভারের গাড়ী চালান। বাপ্ রে! কিন্তু স্বেযোগটা শতাব্দী সেন উপেক্ষা করল না, আলাপ জমিয়ে নিল একথা সেকথায়। এমন কি একদিন ওদের বাড়ীতে যাওয়ার নেমস্তম্ভও পেয়ে গেল। থাকে ক’লকাতার উপকণ্ঠে, বাবা একটা অনতিথ্যাত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। বাড়ী ফিরে সেদিন শতাব্দী সেন ডায়রীতে লিখল—“এই সে, যার জন্ম...” ইত্যাদি ইত্যাদি।

শতাব্দী সেনের আশাবৃক্ষ আজ পর্যন্ত ফলবতী হয় নি। এবার তাই ও জামার রঙে, ট্রাউজারের ভাঁজে, গোল্ডফ্লেকের ধোঁয়ায় সার লাগাল উৎকৃষ্ট এ্যাশোনিয়ার। ক’দিন যাওয়া আসার পর বুঝতে পারল শ্রীমতীর উৎসাহ আছে কলেজ তথা বাড়ীর কম্পাউণ্ডে বৈকালিক ফুটবল খেলা দেখায়। কিন্তু ওর বৃদ্ধির টেউএ ফেনার ভাগ বেশী তাই বুঝল না, আকর্ষণটা ফুটবলের নয়, ফুটবল যাদের পায়ের যোগ্য সেই ভাগ্যবান খেলোয়াড়দেরই একজনের। শতাব্দী সেন হাল ছাড়বার লোক নয়, তাই ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ওদের খেলায় একদিন যোগ দেবার ডাক পেল। অবশ্য যারা ডাকল তারা জানল ওর খেলে পাওয়া ট্রফিগুলো একত্র করতে হলে যা জায়গার প্রয়োজন তা ক’লকাতা শহরে মেলা দুধর বলেই সেগুলো দেখাবার জন্ম কাউকে ডাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত খেলার দিনটি এল। ভগবান ভরসা করে স্কুলের মাঠের কথা স্মরণ করতে করতে বাড়ীর ছাদেই খানিকটা অভ্যাস করল শতাব্দী সেন। সেই কবেকার কথা, যেদিন ও শেষ ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছিল, মনেই পড়ে না!

মাঠ ঘিরে চেয়ার পড়েছে দর্শকদের। প্রফেসর, প্রিন্সিপ্যাল এবং গুঁদের মাঝে সেই অপরূপ। শতাব্দী সেনের চোখে তখন একখানি অনিন্দ্য আনন শতভাবে শত দিকে বিরাজ করছে। বল মারতে গিয়েও কয়েকবার পা সরিয়ে নিল, কেন না ওর মনে হ'ল,—ছি ছি, বল কই—এ যে তারই মুখশ্রী!—সবাই ভাল, ওস্তাদের মার বোধহয় শেষ রাঙেই হবে। হ'লও তাই। একটা গোলের পর গোলদানকারীর উদ্দেশ্যে শ্রীহস্তের হাততালিতে উদ্ভুদ্ধ হয়ে ওঠিক করল আর স্ত্রয়োগ নষ্ট করা চলবে না। সেই জ্ঞানহারা অবস্থাতেই প্রচণ্ড পদাঘাতে কাছে আসা বলটিকে দূরে পাঠিয়ে দিল গোল পোষ্টের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠের চীৎকার ও উল্লাস কাণের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করল। যাক্। কি এক পরম প্রাপ্তিতে আবিষ্ট হয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বিনয়নম্র ভঙ্গীতে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল শতাব্দী সেন। কি অপূর্ব অহুভূতি! এমনিই কি হয়েছিল বুদ্ধের বোধিলাভের আগে, চৈতন্যের কৃষ্ণাভের আগে? ওর সমাধির ভাবটা ভাঙ্গল পিঠে প্রচণ্ড করাবাতে। চারপাশে ঘিরে ধরেছে খেলোয়াড়রা, একজন বলছে—“দাদা, same sideএ গোল দেওয়ার প্রেরণাটা কোন ট্রফিতে জোগাল?”

এ ঘটনার পর একমাস শতাব্দী সেন বাড়ী থেকে বেরায় নি। তবে বাড়ীতে বসে নষ্টও করেনি সময়টা। জীবনে হাসি ও কান্নার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে একটা প্রমাণ সাইজের প্রবন্ধ লিখে ফেলেছে এবং রীতিমত ratio বার করে দেখিয়েছে বাইরে থেকে যেটা অবিমিশ্র হাসি বলে মনে হয়, আসলে তার মধ্যে কান্নার ভগ্নাংশ কতখানি থাকে।

হৃদয়ের মৃত্যু

সঞ্জয় মজুমদার—চতুর্থ বর্ষ : সাহিত্য

না-না আমি তোমায় ডাকবনা ;
আমার বাঁশী ক্লান্ত হল জেনে
রাতের পলাশ ঘুমিয়ে গেছে বুঝি ।
এখন আমি দৃষ্টি-শায়ক হেনে
তোমার বৃকে চিহ্ন আঁকবনা ।
না-না আমি তোমায় ডাকবনা ।

আমার মাটা স্তরু জানো নাকি ?
শূত্র হাওয়া বৃত্ত এঁকে এঁকে
ভাবনাকে আর ছোঁয় না সোজাসৃজি,
বিহ্বল মনে যায়না তুহাত রেখে ।
লজ্জা আমার কোথায় বল রাখি,—
শূত্রে যখন শূত্র কেবল বাকি ?

রাতের দেউল সাজিয়ে রেখো নাকো
মুগ্ধমাসের কৃষ্ণচূড়া ফুলে,
অাকাশ-আলোর দীপ্ত নির্ঘাসে
পাত্র ভরে নিয়োনা আর তুলে ।
শঙ্খবতী, তৃষ্ণা তোমার ঢাকো,
কঠিন-আশা লুকিয়ে রাখো, রাখো ।

তোমার কাছে কিছুই রাখব না ।
সূর্যপ্রহর কাটিয়ে মুখর কাজে
ফিরব না আর তোমার গৃহের পাশে ।
রাত্রি-ঘন বিবশ মনের ভাঁজে
তোমার স্মরণ জাগিয়ে রাখব না ;
অবোধ মেয়ে, তোমায় ডাকবনা ॥

দুটি কবিতা

সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ, কলা

ভিলানেল

ওড়ায় বরাপাতা ব্যাকুল বৈশাখী ।
হৃদয় সন্ন্যাসী মুগ্ধ মধুমােসে
উতল তাপসিনী বাতাস বাঁধে রাখী ।

মুক্ত করি তাকে : সবুজ টিয়াপাখী
সোনার খাঁচা ছেড়ে হারায় নীলাকাশে ।
ওড়ায় বরাপাতা ব্যাকুল বৈশাখী ।

মত্ত মজার গন্ধ দেহে মাখি
ক্রান্তি আসে যদি দীর্ঘনিশ্বাসে ।
উতল তাপসিনী বাতাস বাঁধে রাখী ।

কে যায় পথে ওই, কে আসে : চেয়ে থাকি
হৃদয় ব্রতচারী কঠোর সন্ন্যাসে ।
ওড়ায় বরাপাতা ব্যাকুল বৈশাখী ।

বিদায় দিই যাকে একদা আর তাকি
গোপনে চুপি চুপি আবার ফিরে আসে !
উতল তাপসিনী বাতাস বাঁধে রাখী ।

কখনো তবু ভয় : আবার বুঝি ডাকি ।
কখনো তবু আশা : আছে সে আশেপাশে ।
ওড়ায় বরাপাতা ব্যাকুল বৈশাখী ।
উতল তাপসিনী বাতাস বাঁধে রাখী ॥

—র ডায়েরী থেকে

মধ্যরাত্রে ফিরে আসি হোটেলের আঠারো নম্বরে ।
 সতেরোর উঁকি দিয়ে দেখি সে তখনো বসে পড়ে ।
 আমি থাকি আঠারোয়, সতেরোর মন্দিরা কাকতি ।
 অঙ্কের নিয়ম মেনে শূত্রের দিকেই যার গতি
 হয়না নিঃশেষে লীন তবু তার ধনাত্মক মান
 কিছতেই । অতএব চার ফুট ইঁটের ব্যবধান
 কল্পনায় ধ্বংস করি আনন্দে দুহাতে দিই তুড়ি ।
 স্বপ্নকে নিহত করে আততায়ী রোদ্দুরের ছুরি ।

আমি ক্রীতদাস নই উচ্চাশার । সকালে বিকেলে
 শিস্ দিয়ে কাল কাটে : আমি এক ছিন্নবাধা ছেলে ।
 অভিভাবকের আশা, ভবিষ্যৎ, পরীক্ষার পড়া
 ইত্যাদি সমস্ত কিছু কাগজের টুকরো দিয়ে গড়া
 নৌকার মতন যেন ভাসাই নদীর চূর্ণ স্রোতে—
 যে নদী প্রগল্ভ বেগে যৌবনের হৃদপিণ্ড হতে
 উচ্ছ্বসিত হয় রক্তে, শরীরে, শিরায়—সারাদিন
 আমি তারি অলক্ষ্যের দুরন্ত জোয়ারে হই লীন ।

সে তার নিষ্ঠায় মগ্ন : আড়ালে সমস্ত দিন কেটে
 যায় । আমি ভাবি হায় জাগবে কবে উন্নত কর্ণেটে
 মিশরের মৃত আত্মা মাংসের মক্ষণ পিরামিডে !
 প্রাগৈতিহাসিক কাল বারান্দার বুলন্ত অকিডে
 খেলা করে হেমন্তের মেরুণ সন্ধ্যায় । আর তারি
 অবসরে যদি তার কণ্ঠ শুনি : একটু আসতে পারি ?
 দরজা খুলে চেয়ে দেখি—ওইদিকে বারান্দার কাছে
 আলোর ত্রিভুজে হাওয়া : মন্দিরা কাকতি ঘরে আছে ।

শৈশব কেটেছে যার ভালুকের নাচ দেখে পথে
 এবং কৈশোর গেছে সিগারেটে, নিষিদ্ধ পুস্তকে,
 অধুনা সে ক্ষান্ত হয় মাত্র ছটি বিয়ারের গ্লাসে ।
 আহত পৌরুষ নিয়ে দিন শুধু যায় আর আসে ।

যৌবনে অক্ষম আমি । এপ্রিলের ঘুম-না-আসা রাতে
 যে থাকে চার ফুট দূরে চোখ বুজে স্বপ্ন দেখি তাকে ।
 আর এই কথা শিখি জীবনের জটিল জ্যামিতি
 যতবারই পাঠ করি সবচেয়ে সত্য এ প্রমিতি :
 হৃদয়ের এই বুস্তে তার স্থিতি স্পর্শকের মত
 একটি বিন্দুতে সত্য : সংক্ষিপ্ত সংযত অনায়ত ।
 এবং একথা ওই ইস্কুলের ছেলেটাও জানে
 বিন্দুর অস্তিত্ব শুধু চিন্তায়, বিশুদ্ধ অল্পমানে ॥

আশ্বিনের মাঠে

জয়চরণ সরকার—প্রাক্তন ছাত্র

আশ্বিনের মাঠে মাঠে ধানের শিশুরা খেলা করে,
 নবাগত শিশিরের নীল গন্ধে তন্নয় বাতাস
 ফিরেও দেখেনা, শুধু সূর্যের সোহাগ পড়ে ঝরে,
 অসংখ্য চুমায় রাঙা লজ্জানত সকালের ঘাস ।

শ্রাবণ স্বপ্নের মত, আজও ক্ষীণ কালো ছায়া তার
 চোখে ভাসে, বুকে গৃঢ় অঙ্ককার ভয় গাঢ় হয়,
 ফুটো চালে কান্না বরা অনিচ্ছুক ভাদ্র অল্পদার,
 বিদায়ের উপহার নিয়ে গেছে মেহের আশ্রয় ।

মাটির যৌবন গত, জরাগ্রস্ত রোগীর বিকার
 বিজ্ঞাপিত । কেটে যায় নিরন্ন অনেক দিন গুণে,
 তবুও প্রাণের স্নেহে চূর্ণ হয় মাটির মিনার
 আকাশ সীসের পর্দা তোলে আশ্বিনের গান শুনে ।

তার চুলে খেলা করে শরতের উধাও বাতাস
রুদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে জাগে অনাগত পৌষালী গান,
ক্লিষ্ট প্রাণে উদ্দীপিত হেমশ্বেত অসীম আশ্বাস,
স্বপ্নের সেতারে বাজে বুকভরা আমনের ভ্রাণ ।

আদিগন্ত প্রসারিত আশ্বিনের উদার ললাট ।
চোখে তার নীলমায়া, স্বপ্ন-সংসার ছোট ঘরে,
মেহের দৌরাশ্বে ভরা মাঠ ঘাট রোয়াক কপাট ।

আশ্বিনের মাঠে মাঠে ধানের শিশুরা খেলা করে ॥

দুটি কবিতা

কেতকী কুশারী—চতুর্থ বর্ষ, কলা

এক

ব্যাকুল হ্রের পেলব ছন্দে শরীর তোমার রবীন্দ্রসঙ্গীত,
আমি শুধু তার চন্দ্রতারার প্রতিধ্বনি,
নিখর দীঘির গভীর রুক্ষে দৃষ্টি তোমার অনিদ্র মুর্ছনা,
ক্ষীণ লয়ে গাঁথা আমার আশার বন্ধবেণী ।
তোমাকে পাবই স্থির প্রত্যয়ে ভুবনে আমার বিমূর্ত কল্পনা,
আমার ভঙ্গী তোমার খুশীর প্রতিচ্ছবি ।
আমার বাসনা সাক্ষ্য বায়তে নীল সমুদ্রে মুহূর্তে স্তম্ভর
প্রতিবিস্তিত অস্তমদির স্বর্ণরবি ।
জেনেছি আমার দ্বিধা সত্তার তুমি প্রসারিত বিমুক্ত অধর,
যদি জানা যেত শুধু দুস্তর ব্যবধান,
হ্রস্ব পাখী তাহলে হত না এত নির্ভয়ে নিঃসীমে উড্ডীন,
শোণিতে আর্দ্র হত না ব্যাধের ক্রুর বাণ ।
হায় সে শোণিত এখন ব্যাপ্ত আকাশে বাতাসে নির্মল অঙ্গণে
জমাট তোমার রজনীগন্ধা-হালুকা বৃকে,

তোমার আমার চরাচর যেন পাগল কবির প্রমত্ত জলযান,
 শুধু লোনা জল, হাল-মান্ডল দীর্ঘ শোকে ।
 আঙুরে শিশির বরষে যখন না মেনে বিরোধ অসহায়ে নিঃফলে
 হয়েছে বনানী ছায়ামান তার যন্ত্রণাতে,
 আমার হৃদয়ে গ্রহসঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে অস্তিম বাস্মারে
 যন্ত্রে যন্ত্রে বেদনাদীর্ঘ বন্দনাতে ।
 যে যে বাধা পাই দূরে তো সরাই, তবু পর্বত সম্মুখে উদ্ধত,
 স্ফুরিত এ কি পৃথিবীর শুধু ব্যঙ্গ নাকি ?
 মূর্ত্যবাসীর থাকা-না-থাকার প্রান্তরে বাধা দিগন্তে বিস্তৃত,
 লঙ্ঘন করা চিরকালই বুঝি থাকবে বাকি !

দুই

যখন বর্ষণক্রান্ত প্রদোষের নির্জীব আকাশে
 অশথের স্নিগ্ধ স্নায়ু ব্যাপ্ত ছিল শাখা-প্রশাখায় ।
 অক্ষুট সবুজ গন্ধে ভবিষ্যের হয়নি সঞ্চারণ ;
 রাত্রির আরম্ভে এল আরও জল নিবিড়ধারায় ।

চেতনার চতুর্দিকে রিম্বিম জলীয় রেখায়
 দিগন্ত তলিয়ে গেল, আরও নীচে, পাতালে, কোথায় ?--
 মুছে গেল ভিন্ন জন্ম, ধুয়ে গেল সূর্য্যভরা দিন,
 পাতার আনন্দে হল ইটের পাঁজার আত্মা লীন ।
 বরে জল, বরে জল, জল বরে রূপকথা নীলে,
 স্তূর ডেনিশ স্বপ্ন, রাজহাঁস, জলকণা দোলে ।

বর্ষা একক ঋতু, পৃথিবী তরলশব্দময়,
 ধ্বনির গভীর সীত্রে ঘুম এল মুক্তার মতন,
 অনেক শ্রমের রত্ন, কাচপাত্রে নিজস্ব আলোক,
 তন্দ্রালু জলজ শিশু, রাজা মাছ লঘুসঞ্চরণ ।

আমাদের কথা

ক্রীড়াবিভাগের বাৎসরিক বিবরণী :

এবার নবনির্বাচিত ক্লাস-প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রথম সভায় মিলিত হন গত ১৭ই আগস্ট (১৯৫৬)। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদকগণ এই সভাতেই নির্বাচিত হন। ছাত্রীরা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এর পর কাউন্সিলের বাজেট সভা হয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং এই বাজেট কমিটির সভায় পেশ করা হয়। সভায় তা গৃহীত হয়।

নীচে সকল বিভাগের কাজের বিবরণ দিলাম :

ফুটবল :

গরমের ছুটির পর ফুটবল অনুশীলন শুরু হয়। কলেজ টিম গঠনের জন্ত একটা Trial হয়। আন্তঃকলেজ লীগে আমরা আমাদের গুপের মাঝামাঝি ছিলাম। ইলিয়ট শীল্ডে আমরা চারুচন্দ্র কলেজের সঙ্গে হারি। হেরথ মৈত্র শীল্ডে আমরা হুগলী মহানীনের কাছে জিতে বিদ্যাসাগরের কাছে হেরে যাই।

আন্তঃশ্রেণী লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয় ৪র্থ বর্ষ। অধ্যক্ষ B. M. Sen Challenge Cup এর ফাইনাল খেলায় Post graduate দল ৪র্থ বর্ষকে হারিয়ে দেয়।

এবার আমাদের কলেজ থেকে Calcutta university represent করেন শ্রীননীগোপাল দত্ত।

শ্রীবিদ্যাকুমার চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক

শ্রীপ্রদাপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—অধিনায়ক

ক্রিকেট :

কলেজের অছাত্র খেলার তুলনায় ক্রিকেটেই সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা যায়। অছাত্র খেলায় এগারোজন খেলোয়াড় হয় না। ক্রিকেটে এগারোজন হবার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায়।

একটা Trial খেলার পর কলেজ দল বেছে নেওয়া হয়। এবার ৫টি শ্রীতি খেলা হয়েছে। এর মধ্যে আমরা ১টা জিতেছি, ৩টে ড্র করেছি আর একটাতে হেরেছি।

এবার Past vs Present এর Festival Match টি হয় ১৫ই জানুয়ারী তারিখে। এতে Past team জয়লাভ করে।

আন্তঃশ্রেণী নক-আউট প্রতিযোগিতায় Post graduate দল ৪র্থ বর্ষকে হারিয়ে অধ্যক্ষ A. K. Chandra Cup লাভ করে।

শ্রীমিত্রিকিরণ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক

শ্রীসোমেশ চক্রবর্তী—অধিনায়ক

হকি :

বহারীতি Trial খেলার পর কলেজটীম গঠন করা হোল। খ্রীতি খেলায় আমরা দুটোতে জিতেছি। দুটোতে হেরেছি। এর মধ্যে একটা খেলা হয় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এক গোলে হেরে যাই।

আন্তঃকলেজ নক-আউট প্রতিযোগিতায় আমরা বিভাগের কাছে দু গোলে হারি। আন্তঃকলেজ লীগে Group Champion হবার পর Semifinalএ আমাদের সঙ্গে City College (General) এর খেলা পড়ল। খেলায় একদিন ডু হবার পর আমরা একগোলে হেরে যাই। ত্রিদিন খেলার পরিচালনা সম্বোধনক হয়নি। আমরা সর্ট কর্ণার থেকে দুটো গোল করেছিলাম। কিন্তু দুটোই নাকচ করা হোল কেন বুঝতে পারলাম না।

শ্রীঅধীপকুমার বহু—সম্পাদক

শ্রীদেবব্রত ঘোষ—অধিনায়ক

রোইং :

গত বছর সভ্যসংখ্যা ছিল ১৪ জন। এবার ৯ জন। আমরা আন্তঃকলেজ রেগেটায় যোগদান করতে পারি নি।

দ্ব্যতীশ সরকার—সম্পাদক

স্মল এরিয়া গেমস্ :

সম্পাদক প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর। তাই কর্মোদ্দীপনা একটু বেশী হবে আশা করা গিয়েছিল। তবু নির্বাচন ও তৎপরবর্তী কতিপয় দিবস ছাড়া চেষ্টা করেও তাঁর সাফল্য পাওয়া যায়নি। সাধারণ সম্পাদককেই সব কাজ করতে হয়েছে, মার রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত। (অবশ্য সব বিভাগের সম্পাদকেরাই এ আদর্শ অনুসরণ করেন। রিপোর্ট লেখার মত কার্যিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁরা অক্ষম। সাধারণ সম্পাদকই এ কাজটুকু সম্পন্ন করেন।)

আন্তঃ কলেজ নক-আউট খেলার জন্ত আমরা নাম পাঠিয়েছিলাম। সে খেলা হয়নি। আন্তঃ শ্রেণী নক-আউট প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৩য় বর্ষ ৪র্থ বর্ষকে হারিয়ে অধ্যক্ষ J. C. Ghosh cup লাভ করে।

শ্রীশিবশঙ্কর বহু—সম্পাদক

টেনিস :

সভ্যসংখ্যা ছিল ১৪ জন। আমাদের খেলার মান নীচু হওয়ায় আমরা আন্তঃকলেজীয় খেলায় যোগদান করি নি।

শ্রীঅশোককুমার ঘোষ—সম্পাদক

জিমনাসিয়াম :

এ বিভাগটি আপাততঃ বন্ধ আছে, কারণ College Sweeper দের ঐ জায়গায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রী বিভাগ :

এ বিভাগটি আদৌ থাকার কোন আবশ্যকতা আছে কিনা তা বিবেচ্য। শ্রীমতী কেয়া ঘোষ কলেজ ছাড়ার পর শ্রীমতি শান্তা সেনগুপ্তা এ বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে ব্যাডমিন্টন র‍্যাংকেট হাতে ছাত্রীদের ঘুরতে দেখা গেছে। আর sport-এর সময় কিছুসংখ্যক ছাত্রীকে মাঠে নামানো সম্ভব হয়েছিল। ক্রীড়াবিভাগের ৬,৬০০ টাকার বাজেট থেকে অতি ক্ষুদ্র এক অংশ (৭৫) ছাত্রীবিভাগকে ব্যয় করার জন্ত দেওয়া হয়েছিল। তা থেকে সারা বছর ধরে তাঁরা ব্যয় করেছেন মোট ৫ টাকা। কৃতিত্ব বটে।

শ্রীমতি কেয়া ঘোষ—সম্পাদিকা

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা :

এইটেই কলেজের একমাত্র প্রতিযোগিতা যাতে মাঠের চারিপাশে তিলধারণের অবধি থাকে না। বছরের অন্ত্যন্ত খেলার সময় ছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশুনার ব্যস্ত থাকেন। এবং মাঠের চারিপাশ নিয়মিত ভাবে খালি যায়। এইদিন ছাত্রীরা নিজের নিজের ক্লাশের প্রতিযোগীদের চেষ্টা নিয়ে উৎসাহ জানায়। কলেজমাঠ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের vice-chancellor শ্রীনির্মল সিদ্ধান্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

ছুজন ছাত্র এবার আন্তঃকলেজ স্পোর্টস্ এ যোগদান করেছিলেন।

এবার ছাত্রদের Javelin throw ও ছাত্রীদের obstacle Race এর পরিবর্তে যথাক্রমে Cycle Hockey ও Observation Test এর আয়োজন করা হয়েছিল।

নিয়মমাফিক বিবরণ বিলাম। এবার কয়েকটা কথা বলব, কথাগুলি অশ্রিয় এবং সত্য। সম্পাদক নির্বাচন থেকে শুরু করে খেলার মাঠ পর্যন্ত ক্রীড়াবিভাগের সকল বিষয়ে দয়ী ছাত্রীরাই গণ যে ক্রমবর্ধমান উৎসাহের পরিচয় দিচ্ছেন তাতে এ বিভাগের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি সন্নিহান হয়ে উঠেছি। নির্বাচনের সময় কোরাম্ হয় না। খেলার মাঠে খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়েরই অভাব। উল্লেখ্য কার বলতে পারি না (সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের হস্তভাগ্য কোন খেলোয়াড়ের) : “কলেজে ১১ জন খেলোয়াড় আছেন। তারা সব খেলাই (ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলি) খেলেন। এবং নিজেরাই খেলা দেখেন।” এমন সত্য ভাষণ কদাচিৎ শোনা যায়। তবু কলেজমাঠে খেলা হোলে বেকার ল্যাবরেটরীর সর্বোচ্চ তলা থেকে মাঝে মাঝে দু-একটি কোঁতুহলী মুখ উঁকি দিয়ে যায়। অধ্যয়নশীল ছাত্রেরা সময়ের অপব্যয় করতে রাজী নন। এমন উৎসাহ ও উদীপনা পাওয়ার ফলে আমরা নিয়মিতভাবে হেরে থাকি। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম হয়। স্বভাবতঃ সমালোচনা হয় এবং হওয়া উচিতও। আমার বলার কিছু নেই। তবু বলবো, এক্ষেত্রে দুটি পথ খোলা আছে। এক নম্বর, সমালোচকেরা যদি একবার মাঠে নামেন? দুই নম্বর, এটাই বরং সহজ ও সরল, ক্রীড়াবিভাগটির বিলোপসাধন। যাক—দীর্ঘ এক বছর এ বিভাগটির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। কতটুকু দিতে পেরেছি জানি না। তবু আমি যা পেরেছি তাতেই আমি পবিত্র। কামনা করবো আমার উত্তরসূরী যেন আমার থেকে আরো সাফল্য অর্জন করেন।

সবশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁদের, বাঁদের সাহায্যে ও উপদেশে আমি এগিয়ে যেতে পেরেছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অধ্যক্ষ-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জী, বিভাগীয় সভাপতি, সম্পাদক ও অধিনায়কদের।

অশোককুমার দাশগুপ্ত—সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াবিভাগ

অর্থনীতি সেমিনার :

মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি। কিন্তু বিবরণী দেবার সময় এসেছে। প্রথমত এবং প্রথমত সেমিনার ঘর নিয়ে হাতছাড়া আর নাই বা করলাম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সার্থক হোক, শুধু এই প্রার্থনা।

সেমিনারের প্রধান কাজ নিয়মিত বই দেওয়া-নেওয়া। এ কাজটি একান্তই অর্থনৈতিক, চাহিদা ও যোগানের অতিপরিচিত প্রক্রিয়ায় উপর নির্ভরভাবেই নির্ভরশীল। সেমিনার সম্পাদক এক্ষেত্রে 'middleman' মাত্র। অতএব সেমিনারের বই সম্পর্কে বন্ধুদের যে চিরন্তন যাহা-চাই-তাহা-পাই-না অভিযোগ, সে ব্যাপারে সম্পাদক নিতান্তই অসহায়। আশার কথা, আমাদের সেমিনার লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বই সরবরাহ করার 'প্রতিশ্রুতি' সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

গত কয়েকমাসে অর্থনীতি সেমিনারের পক্ষ থেকে মোট চারটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'Rural Reorganisation in India' (শ্রীঅরুণোদয় ভট্টাচার্য) 'Problems of Capital Formation in Underdeveloped countries' (শ্রীপ্রণবকুমার বর্মন) 'Employment and 2nd Plan' (শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী) এবং 'The Challenge of the 2nd Plan' (শ্রীদ্বিজেন ভট্টাচার্য)—এই চারটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। প্রবন্ধ পাঠের পর বিস্তৃত আলোচনা, যুক্তি (ও অযুক্তি)-বহুল তর্ক এবং ক্লাস্ত উপসংহার।

ভবিষ্যতে আরও দুয়েকটি আলোচনা-সভা আহ্বান করার আশা রাখি। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সর্বোদয়কর্মী শ্রীমতী বিমলা থাকর আমাদের সেমিনার-আয়োজিত এক সভায় ভূদান-আন্দোলন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ একটি ভাষণ দেন।

এ ছাড়া অস্থায়ী অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিদায়ী চতুর্থ বর্ষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বোষকে বিদায়দম্বর্ষনা।

এ বছর ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশনের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি Planning Forum স্থাপিত হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে পরিকল্পনাবোধ জাগ্রত করা এবং জাতীয় সঙ্কল্পভাণ্ডারে ছাত্রদের সাহায্যদানে উৎসাহিত করা এই প্রধান উদ্দেশ্য। গত ৩রা সেপ্টেম্বর এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিسابে দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ এবং বিস্তৃত ভাষণ দেন।

এই স্বল্পকাজের ফিরিস্তি নিয়ে দীর্ঘ বিবরণী লেখার প্রচেষ্টা হাস্তকর। কাজের স্বল্পতার জন্ত সম্পাদক সম্পূর্ণ নির্দোষ না হ'লেও সেমিনারের বর্তমান পরিস্থিতি বোধকরি অধিকতর দায়ী। স্বগঠিত এবং সক্রিয় একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠচক্র গড়ে তোলবার জন্ত যে ধরণের সামর্থ্য, অবসর, পরিবেশ এই উৎসাহের প্রয়োজন, বর্তমান অবস্থায় তা হতাশাজনকভাবেই কম। বিশেষ করে পরিবেশ—মাত্র' যাকে বলবেন environment—তার প্রভাব অমোঘ।

তথাপি সত্যিকারের কাজ করবার পরিসর একেবারেই নেই বললে অতুক্তি করা হবে। বিশেষত বহু পুরাতন এই সেমিনারে একটি প্রাচীর পত্রের অভাব নিতান্তই বেদনাদায়ক। এ বিষয়ে আমরা অর্থসংগ্রহে ব্যাপৃত আছি।

আর তাছাড়া সেমিনারের একটি নির্দিষ্ট Fund থাকা প্রয়োজন। এ ব্যাপারেও আমরা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলাম। বলা বাহুল্য এই ক্ষেত্রে বন্ধুদের স্বাভাবিক শৈথিল্য।

বই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে পূর্বসূরীদের নাস্তিমসৃণ অভিজ্ঞতার ইতিহাস প্রারম্ভে ভীতির সঞ্চার করেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বন্ধুদের কাছ থেকে যে সহায় ব্যবহার পেয়েছি তার জন্ত আমি গর্বিত বোধ করি। সেমিনারের অস্থায়ী কাজের সার্থকতার মূলেও আছে বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতা। আর আছে শ্রদ্ধের অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মূল্যবান উপদেশ এবং অকুণ্ঠ সহায়ত্ব।

আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঋণ শোধের বৃথা চেষ্টা করব না। সবশেষে, সেমিনার-আয়োজিত শ্রীতি-সম্মিলনীতে উদ্বোধন এবং সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য শ্রীচিত্রলেখা চৌধুরীকে এবং মধ্যে মধ্যে নেহাৎই দারুণময় একটি পার্টিশানের অন্তরাল থেকে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক পরিবেশনের ছনিবার প্রচেষ্টার জন্য গার্লস কমন্সকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রণবকুমার বর্ধন।

—সম্পাদক, অর্থনীতি সেমিনার

প্ল্যানিং ফোরাম—সম্পাদক

রাজনীতি সেমিনার :

অস্বাভাবিক বৎসরের তুলনায় এবার আমরা সেমিনারের ভার একটু আগেই পেয়েছিলাম। আমাদের কাজ শুরু হয় চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের বিদায় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। মুহূর্ত এবং অনাড়ম্বর পরিবেশের মাধ্যমে এই বিদায়-সম্মেলনটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং প্রধান অতিথি হিসাবে অধ্যক্ষ ফ্রেণ্ড পেরেরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে নিম্নলিখিত আলোচনা সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় :—

1. Parliamentary Democracy in U. K.—Ramgopal Agarwalla.
2. The Political Ideal of Nationalism—Prakash Khaitan.
3. Democracy and Totalitarianism—Manish Nandy.
4. Interrelation between Liberty and equality—Prakash Khaitan.

এর মধ্যে শ্রীমণীশ নন্দীর রচনাটি মৌলিকত্ব এবং ভাবগভীরতার জন্য খুবই প্রশংসনীয় হয়, এবং এই দিনের আলোচনা-সভাটিও খুবই চিত্তাকর্ষক এবং উচ্চস্তরের হয়েছিল। সেমিনারে সংসদসদস্য শ্রীসাঁধন গুপ্ত কর্তৃক 'Parliamentary Democracy in India' এই বিষয়ের উপর একটি ভাষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বক্তার আকস্মিক অসুস্থতার জন্য এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীমণীর বক্তার পূর্বে রাজনীতির অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ উচ্চতর গবেষণার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তাঁকে সেমিনারের তরফ থেকে বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়। রমেশবাবুর পরিবর্তে যোগদান করেন অধ্যাপক নির্মলকুমার মজুমদার।

সেমিনার সম্বন্ধে আমাদের দুটি প্রধান অভিযোগ হ'ল : সেমিনারকক্ষ পরিবর্তন করার ও সেমিনারের জন্য একটি প্রাচীর পত্রিকার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। এশিয়ার অত্যন্ত প্রাচীন কলেজের অর্থনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সেমিনারকক্ষ যে এলাকা হতে পারে তা কোন সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। তবে শোনা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কলেজে যে নতুন গৃহনির্মাণ হচ্ছে, তার একটি ভাগ নাকি অর্থনীতি বিভাগকে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রাচীর পত্রিকার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, এবং এজন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা আবেদনও করেছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যের জন্য আমাদের চেষ্টা সফল হয়নি। আশা করি আমাদের পরবর্তী ছাত্রবন্ধুরা এ বিষয়ে অগ্রগী হয়ে সফলকাম হবেন।

সেমিনারের কার্যপরিচালনে প্রত্যেকটি ছাত্রবন্ধুব কাছেরই অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করার আমার কাজের গুরুত্ব অনেকটা লাঘব হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রীপ্রকাশ বৈতানের নাম উল্লেখ না করলে তার প্রতি অবিচারই করা হবে। শ্রীবৈতানের কাছে সময়েচিত্ত অর্থসাহায্য না পেলে অনেক সময় আমাদের পক্ষে সভাসম্মেলনের আয়োজন করা সম্ভব হত না।

পরিশেষে সেমিনার পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান রহম নাহেবের কাছে সময়োচিত উপদেশ ও নির্দেশ পাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দেবকীনন্দন মণ্ডল—সম্পাদক, রাজনীতি সেমিনার

ভূজ্ঞান পরিষদ :

প্রেসিডেন্সি কলেজের এক গৌরবময় সম্পদ হল এই “ভূজ্ঞান পরিষদ”। “ভূজ্ঞান পরিষদ”এর জন্ম বেশী দিনের নয়। ১৯৫০ সালে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে এই “ভূজ্ঞান বিভাগ”। এর আগে Geology বা ভূতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিল Geography বা ভূজ্ঞান বিভাগ। কিন্তু বেদিন থেকে ভূগোল বিভাগের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণিত হল সেদিন থেকেই হল এই স্বতন্ত্র ভূজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানোন্মেষণের এই বিশেষ দিকট উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ভূজ্ঞান-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেল—গঠিত হল “ভূজ্ঞান-পরিষদ”। ভূজ্ঞান-পরিষদ, তখন থেকেই তুলে নিল এক মহান কার্যভার,—পুঁথিগত বিষয়কে, বিচার-বুদ্ধি, পর্যালোচনা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাচাই করে চরম সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করল সে; গঠিত হল একটি স্বতন্ত্র “পাঠাগার”, “পাঠ-চক্র”—বা আলোচনা সভা, “পরিক্রমা” বা প্রাচীর পত্রিকা, আর ব্যবস্থা করা হল “জ্ঞানোন্মেষক পরিভ্রমণ”—এর।

এতগুলো গুরু দায়িত্ব নিয়ে প্রতিবারের স্থায় এবারেও আমাদের পরিষদের কাজ মহত্ব গতিতে চলে এগিয়ে।

এ বছরের পাঠচক্রের এক স্মরণীয় অধিবেশন হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডাঃ এম, পি, চ্যাটার্জীর “জাতীয় উন্নয়নে ভূজ্ঞান বিষয়ের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা”। অপর একটি অধিবেশনে “কুলু উপত্যকা” সম্বন্ধে আলোকচিত্র মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ ভাবঘন দর্শন অধ্যাপক শ্রীহরীবোষ বোস। অপর আরেকটি আলোচনা সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডাঃ সিতাংশু মুখার্জী “ভূজ্ঞানের পরিধি ও প্রকৃতি” সম্বন্ধে এক মারগত বক্তৃতা দেন।

এই বছরের অপর দুটি বিশেষ অধিবেশন হল দুটি বিদায় সম্বর্ধনা। প্রথমটি দেওয়া হয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমোথনাথ ছোড়কে, এবং অপরটি দেওয়া তরুণ অধ্যাপক শ্রীপুরঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের সম্বর্ধনা দেওয়ার রীতি এইবারই সর্বপ্রথম প্রচলন করা হল।

এ বছরের পরিভ্রমণের ব্যাপার পুরন্দমেই এগিয়ে চলে। “মাইসেঞ্জোর” ও “বোলপুর-শান্তিনিকেতন” পরিদর্শন করা হয় প্রথম দফায়। পরর্তী পরিভ্রমণ ঘটে আমাদের ৩য় বর্ষ সাম্মানিক ছাত্রনিবেদীদের এক ছোট দল নিয়ে—“রাঁচী” ও “নেদারহাট” উপত্যকা প্রদেশে। আমাদের সর্বশেষ পরিভ্রমণ হয় “চান্দ্রপুর-বালেশ্বর” এলাকায়।

ভূজ্ঞান পরিষদের পাঠাগারটি বহু দুপ্রাপ্য ও দুমূল্য বইয়ের খোরাক। এটির পুস্তক তালিকা অভিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীতরুণ লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে এ বছর যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে।

অবশেষে এটুকু স্বীকার করব যে আমাদের কার্যোপলক্ষ্যে আমরা যেমন ছাত্রদের সহযোগিতা পেয়েছি, সেই রকম পেয়েছি আমরা আমাদের বিভাগের অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রেরণা। এ ব্যাপারে আমাদের পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীতরুণ লাহিড়ী এবং সহযোগী অধ্যাপক শ্রী এম, গোস্বামীকে আমরা পরিষদের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীঅশোক ঘোষ—সম্পাদক

বাংলা পাঠচক্র :

কলেজ পত্রিকার পূর্বের একাধিক সংখ্যায় বাংলা পাঠচক্রের কোনো বিবরণী প্রকাশিত হয়নি। পাঠচক্রের সম্পাদকদের কাছে কারণটা কতকাংশে এইরকম ছিল যে, তাঁরা এমন কিছুই করেননি, যা পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়। ‘এমন কিছুই’ হয়তো আমরাও করতে পারিনি, কিন্তু তাঁদের মতো একেবারে ‘নিষ্কর্ম’ও ছিলাম না ;—পাঠচক্র নামটির সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত আংশিক সার্থকতা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম প্রাথমিক পথে পরিক্রমণ না করেই।

আমাদের স্মরণীয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের তিরোধান উপলক্ষে আয়োজিত শোকসভাটিই প্রথম। এই সভায়, ব্যক্তি যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে জ্ঞান-তাপস আচার্য যোগেশচন্দ্রের যে যোগ ছিল একান্ত নিবিড়, ব্যক্তিগত পরিচয়সূত্র ধরে সেইদিকটাই উল্লেখ করেন, সভাপতির অভিভাষণে আমাদের প্রদ্বন্দ্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়। সভা অন্তে সর্বসম্মতিক্রমে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত এবং প্রেরিত হয় স্বর্গত বিদ্যানিধি মহাশয়ের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকটে।

এই বৎসরেই আমরা হারিয়েছি যুগন্ধর কথামঞ্জরী মাসিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিশেষ করে তিনি ছিলেন এই কলেজেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র—এ গর্বও আমাদের করবার মতো। “রবীন্দ্র-পরিষদ”র সভাপতি প্রদ্বন্দ্ব অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের উপদেশ মতো “রবীন্দ্র-পরিষদ” এবং “বাংলা পাঠচক্র”র সমবেত উদ্যোগে “ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে” তাঁর স্মৃতি-তর্পণের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া, ২২শে শাষণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি “রবীন্দ্র-স্মরণ-তিথির”ও আয়োজন করা হয়েছিল।

আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের “বিদায় সম্বর্ধনা”ও আমরা জ্ঞানিয়েছিলাম।

এইবার, আমাদের পাঠচক্রের মুখপত্র প্রাচীর পত্রিকা “আশাবরী”র কথায় আসা যাক। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং পাঠচক্রের পাক্ষিক অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি এতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে, একটি কথা উল্লেখ্য বলে মনে করি। “আশাবরী” আমাদের সেই ধরণের প্রাচীরপত্র যাতে শুধু প্রবন্ধ বা আলোচনাই প্রকাশ করা হয়—কবিতা বা রম্যরচনা নয়। এতে সাহিত্যের এই দুটি শাখার প্রতি হতাশার প্রকাশ করা হয় না—আমাদের কার্যধারা যাতে সংহতভাবে অগ্রসর হ’তে পারে সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হ’তে দেখেছি বহুবার; তাই আগামী তৃতীয় বর্ষের সম্পাদকের কাছে অনুরোধ রইলো তিনি যেন এই কথাটি মনে রেখেই তাঁর কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করেন।

পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের এবং লেখকের নাম নিয়ে দেওয়া গেল :—

- ১। মণীষী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল।
- ২। যোগেশচন্দ্র স্মরণে—শ্রীপল্লবকুমার সেনগুপ্ত।
- ৩। রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেম—শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
- ৪। সাহিত্য ও কল্যাণবোধ—শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য।
- ৫। কথামঞ্জরী মাসিক বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীশান্তা সেনগুপ্ত।
- ৬। মাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে—শ্রীসঞ্জয় মজুমদার।
- ৭। আধুনিক বাংলা ছোট গল্পের গতি—শ্রীরমেন্দ্র ভট্টাচার্য।
- ৮। বিসর্জনের নাট্যবস্তু—শ্রীশুভঙ্কর চক্রবর্তী।

এর মধ্যে ৪, ৭ এবং ৮নং প্রবন্ধগুলি, আলোচনাসভায় বিতর্কমূলক বিষয়ে পরিণত হওয়ায় বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল।

এরপর, উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে অধ্যাপকগণের যাওয়া-আসা। বৎসরের প্রথমের দিকেই অধ্যাপক শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয় অল্পত্র কার্যভার গ্রহণ করে কলেজ ছেড়ে চলে যান। তার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত মহাশয়কে। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রধান অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীকালিপর সেন মহাশয় তাঁদের কার্যকাল সমাপনান্তে একই সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন। আমরা তাঁদের অবসর-জীবনের শান্তি কামনা করি। এই উপলক্ষে বাংলা বিভাগের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রদের সমন্বয়ে এক বিদায়-সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীহরবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়। তাঁর নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

সবশেষে স্মরণ করি, পাঠচক্রের সকল কাজেই আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের সন্তোষ সহযোগিতার কথা। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী মহাশয় পাঠচক্র পরিচালনার অনেক গুরুদায়িত্ব নিজে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া, এ বিষয়ে সজীর্থদের কাছ থেকে নানাভাবে যে সাহায্য পেয়েছি তার শেষ নেই। তথাপি শ্রীপ্রণান্ত পাল, শ্রীশান্তা সেনগুপ্ত, শ্রীসঞ্জয় মজুমদার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে অপরিহার্য কতকগুলি বিষয়ে সাহায্য করে, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বাক্যে আরো বাড়িয়েছেন।

তথাপি জানি অনেক কাজই অপূর্ণ থেকে গেছে। আশা করবো আগামা সম্পাদক সেগুলিকে সম্পূর্ণ করে বাংলা পাঠচক্রের শ্রীবৃদ্ধি করবেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক, বাংলা পাঠচক্র

পদার্থবিজ্ঞান সেমিনার :

পূর্ব-স্বরীদের অনুসরণে পদার্থবিজ্ঞান সেমিনারের কাজ যথারীতি চলছে। এ বিষয় পৃথিকৃৎ হিসাবে শ্রীকমলকুমার দত্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ বৎসর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল। পাশে প্রধান বক্তাদের নাম দিলাম।

Differential Equations in Physics—চঞ্চলকুমার মজুমদার।

Maxwell's law of distribution of velocities in gases—কমলকুমার দত্ত।

Origin of the universe—সুদেবরঞ্জন চাকী।

The laws of thermodynamics—চঞ্চলকুমার মজুমদার।

Fermat's principle—রণেশ্বরকুমার রায়।

Probability—অম্বর মুখোপাধ্যায় ও সমরেশচন্দ্র মৈত্র।

Bohr Sommerfeld theory of the atom—পদ্মনাভ দাসগুপ্ত।

Entropy and Statistical thermodynamics—চঞ্চলকুমার মজুমদার।

Cosmic rays, and their utility in locating the magnetic poles of the earth—সুদেবরঞ্জন চাকী।

Electromagnetic theory of light—রমেশ্বরকুমার দত্ত।

আমাদের মোট ১২টি অধিবেশন হয়; শেষ অধিবেশনে নূতন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর হাতে সেমিনারের ভার তুলে দিলাম নবাগতদের অভ্যর্থনা জানিয়ে। আশা করি তারা আমাদের চেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দেবে।

চঞ্চলকুমার মজুমদার—সম্পাদক

ভূতত্ত্ব পরিষদ :

প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে 'ভূতত্ত্ব পরিষদের' 'বর্ষজয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হোল এবার ১৩ই জানুয়ারী। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের বিশেষ স্থচী হিসেবে এই উৎসবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্মেলনে আগত দেশবিদেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের পরিষদে পদার্পণে আমরা গবিত। ভূতত্ত্ব পরিষদের মুখপত্র "ভূবিদ্যার" এক বিশেষ সংখ্যা ঐ একই দিনে প্রকাশিত হয়। জার্মানী, সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা ভূবিদ্যার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক পরিষদ থেকে আমরা প্রশংসাবাণী পেয়েছি। এটা খুবই আশা ও গৌরবের কথা।

* * * *

নিয়মিত অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাগুলোতে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাঁদের বক্তৃতার বিষয় হোল—

1. Steel Industry in India & his experiences in recent U. S. S. R. tour By Mr. R. N. Dutta, Ex-Controller, Iron & Steel Control, Government of India.
2. Some Aspects of Mining Legislation By Mr. V. R. Khedkar of C. S. I.
3. Coal Mining tomorrow By Mr. S. L. Chakravarty, Mining Adviser to the Government of West Bengal.
4. Paleo-currents By Dr. F. J. Pettijohn of U. S. A.
5. Origin of Solar System By Prof A. C. Banerjee, Ex—Vice-Chancellor, Allahabad University.
6. Estimation of mineral reserves and mineral resources By Dr. F. Blondel, President, International Geological Congress, PARIS. তাছাড়া ECAFE Conference এ আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ ভারতের খনিজসম্পদ ও অগ্নাশু বিষয়ে আলোচনা করেন।

* * * *

আমাদের বিশিষ্ট সদস্য ডাঃ ডি, এন, ওয়াদিয়া মহাশয়ের F. R. S. নির্বাচিত হওয়া এ বছরের এক স্মরণীয় ঘটনা।

* * * *

ত্রিশ বছরেরও অধিককাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করার পর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত আগস্ট '৫৭এ অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্র ও সহকর্মীদের পক্ষ থেকে এক বিদায় সভার আয়োজন করা হয়।

* * * *

British Council এর সর্জস্বে মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, পরিষদের প্রাচীর পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। Geological excursion এ ছাত্রদের তোলা ভালো ভালো ছবির প্রদর্শনী institute reporter এর অন্ততম আকর্ষণ।

* * * *

পরিষদের বিভিন্ন কাজে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ও অধ্যাপক মহাশয়দের প্রচুর সাহায্য আমি পেয়েছি। তার জন্তে আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীনিখিলরঞ্জন সরকার—সম্পাদক

পরিসংখ্যান পাঠচক্র :

কাজ আরম্ভ হলো অনেক দেৱীতে। আমরা চতুৰ্থ বৎসরের ছাত্ৰরাই উৎসাহী, উচ্ছোক্তা এবং এক কথায় আমরাই শ্ৰেষ্ঠ। আমাদের উৎসাহেই সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ স্থষ্টি হওয়ার ঠিক তেরো বছর পরে স্থষ্টি হলো পাঠচক্র অৰ্থাৎ সেমিনাৱের।

এখন আছে উৎসাহ, উদ্দীপনার অনন্ত অভিব্যক্তি। কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত হয়তো কিছুই থাকবে না—সময় এনে দেবে গতানুগতিক চলার ভঙ্গী কিন্তু আগামী ছাত্ৰদের কাছে আমাদের প্ৰত্যাশা অনেক।

১৯৫৭ সালের ২৭শে জুলাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্ৰভৃতি সৰ্বভাৱতীয় প্ৰতিষ্ঠানের বহু মনীষীর উপস্থিতিতে যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছিল—তা অনেকের অনেক কাল মনে থাকবে। অনুষ্ঠানে পোঁরোহিত্য করেন বিভাগীয় প্ৰধান অধ্যাপক শ্ৰীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য ও প্ৰধান অতিথির আসন অবলুভ্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের প্ৰধান অধ্যাপক শ্ৰীপুৰ্ণেন্দুকুমার বহু।

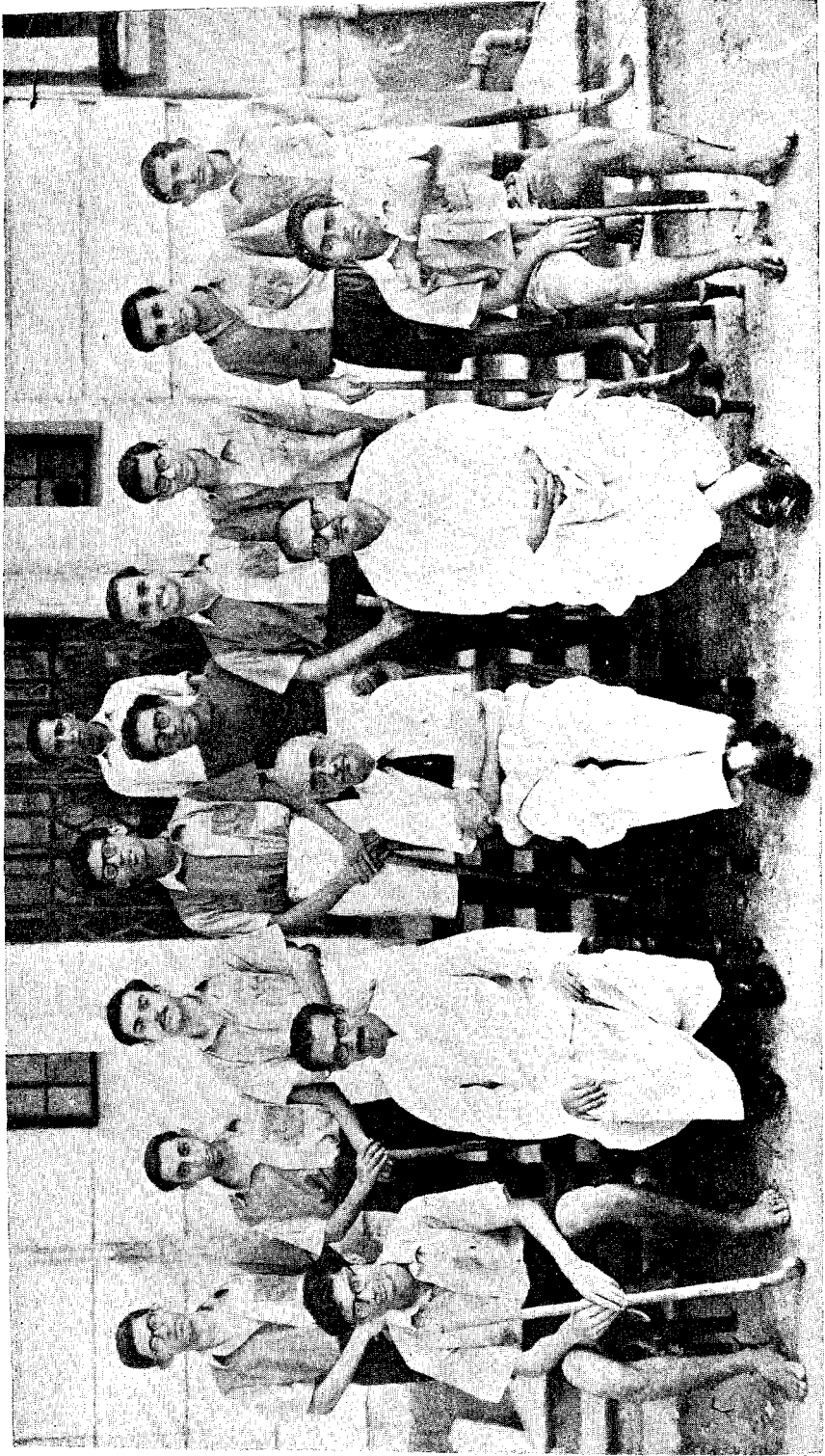
তারপর শুরু হয় বই দেওয়া-নেওয়া। সীমিত সংখ্যার বই নিয়ে বিয়াট চাহিদা মেটানো দুঃসাধ্য ব্যাপাৰ। তবুও সভ্যদের সহযোগী-মনোবৃত্তি আমাদের পাঠচক্র পৰিচালনায় অত্যন্ত সাহায্য করেছে।

কাজ হয়তো কিছু হয়েছে—কিন্তু বাকী আছে অনেক। এ পৰ্যন্ত বিশেষ অনুপ্ৰেৰণা পাইনি। তবে যতটা সম্ভব কাজ করেছি, কতটা সাফলা লাভ করেছি, তা' বন্ধুরা বিচাৰ করবেন।

আশাৰ কথা আমাদের বিভাগটি নূতন প্ৰেসিডেন্সী কলেজ ভবনে স্থানান্তৰিত হবার কথা হচ্ছে। সেখানে অধিকতর সুযোগ সুবিধাৰ মধ্যে আমাদের উত্তরাধিকাৰীরা বিভাগীয় পাঠচক্রের উন্নতি করবে এই কামনাই করি। সবশেষে পাঠচক্রের ভাৱপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক শ্ৰীভাগবৎ দাশগুপ্তকে আমাদের ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্প্ৰীৎ চট্টোপাধ্যায়—সাধাৰণ সম্পাদক

PRESIDENCY COLLEGE HOCKEY TEAM, 1957
 INTER COLLEGE HOCKEY LEAGUE
 GROUP CHAMPIONS



Left to Right : On Chair—A. Barua, Mr. N. Chatterjee (Phys. Instructor), Principal F. J. Friend Pereira, Prof. N. C. Chakravarty, D. Ghose (Captain),
 Standing—A. Mitra, A. Bose (Hockey Sec.), S. Mukherjee, D. Dasgupta, D. Chatterjee, S. Sanatani, A. Dasgupta, P. Ganguli, K. Datta,
 B. Chatterjee (Secretary).

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editorial

All the good things of life have their seamy sides, too. The editor's job, while undoubtedly flattering to one's self-esteem, is not without its attendant headaches, especially when one has to cater to the varied tastes of a body as mixed as the students of Presidency College. A mean, after all, must be struck, some sort of a compromise patched up between the protagonists of prose and the lovers of poetry, between those who see in fiction the *raison d'être* of a college magazine, and those who will not read anything but historical essays. People with vested interests in a whole sheaf of group-photographs must be headed off to appease people who resent the encroachment of such photographs upon the limited space at our disposal. The athlete, one realises, must be satisfied no less than the historical scholar, the coffee-cup politician, the budding biologist, the poet in the green leaf, the young economist, the literary critic, the adolescent physicist and the short story addict.

Above all, however, ours is an age when economics is the grammar of all chaos. One knows, of course, that variety is the spice of a college journal; but, unfortunately—thanks to the economics of scarcity—brevity is its soul. One must, accordingly, somehow compress within the Procrustean bed of strictly limited space a range of material of infinitely varied appeal.

Here, however, the editor is entirely at the mercy of contributors, and it is a strange fact that the writers of Presidency College have an undeniably narrower range of interests than its readers. It is, no doubt, pleasant to feel, in an age when the future of poetry is supposed to be gloomy, that the students of Presidency College lisp in numbers and the numbers come. One is delighted by a deluge of verses, exploring every possible poetic mood and manner—from romantic melancholy to the modern mode, from the pastoral convention to a futuristic defiance of all the laws of grammar and

spelling. So is it with a bountiful harvest of short stories, and a surfeit of criticism, which signifies a welcome revival of interest in literature.

All this, one hopes, may go some of the way towards amending the traditional reputation of the Presidency College Magazine as the stuffy forum of highbrows and eggheads. It is, however, unfortunate in the sense that some exceptionally interesting items in these domains have necessarily to be overlooked. Incidentally also, it is restricted in its appeal. Yet we are helpless. The plentiful crop of verses, short stories and literary criticism contrasts with the astounding poverty of contributions in the realm of popular science. Our historians seem content to let the dead past bury its dead without making much fuss about it in the columns of a college magazine. After a spate of extremely vigorous caricatures in our wall-papers, our cartoonists appear to have become inexplicably coy. Humorous short stories are conspicuous by their absence. Our feelings in favour of the armchair travelogue have been ignored.

This is our apology for our many sins of omission. No doubt, it is—as the intelligent reader has already cleverly noted—an exceptionally lame one. It indicates, however, the directions along which our accomplished writers may proceed to make a better job of our second issue—if, indeed, the inexorable laws of economics permit it ever to see the light of day.

Chesterton the Eccentric

DIPAK RUDRA,

Third Year, Arts.

A tousle-haired giant, carelessly accoutred in baggy tweeds, views with melancholy distaste the marble lions at the foot of Nelson's Column and wishes they were pigs. You have here a true-to-life picture of Gilbert Keith Chesterton, creator of Father Brown, author of 'The Man who was Thursday' and so many other literary flights-of-fancy.

The Chesterton the world knows is the all-too-elevated critic, essayist, philosopher and savant. What escapes overall attention is that he, above everything else, has stood up (with all his towering bulk!) for the cause of downtrodden idiosyncrasy. As a man who never sacrificed his exclusiveness to tradition, he is courageous, if not unique. In surprising harmony with this individualism, he has that rare appreciation of unromantic facts. While flooded Battersea rouses the home-keeping Londoner in him, the soaked mackintosh-and-wellingtons are a vivid adjunct—there is no side-tracking from the 'goose-pimple weather' essence.

His appeal is universal. The 'piece of chalk' is a discovery as exhilarating to us as to the portly, meditative gentleman, sketching the soul of a cow on a Chichester hillock. His frank expostulations are both a challenge—to whosoever may disapprove—and an appeal—to those of us who stifle our innate convictions, to give vent to them. 'The meanest of all fears', he says somewhere, 'is the fear of sentiment'. Sentiment, or eccentricity, whatever highbrows may call it, is too often sheer sincerity. At the risk of being ridiculed, G. K. has poured out the wildest excesses of his unusual mind. 'Brown paper', to him, 'represents the primal twilight of the first toil of creation. Of the Augustans, he writes: 'The inspiration went in like sunbeams and came out like Apollo.' 'Lying in bed,' he says, 'would be altogether perfect if only one had a coloured pencil long enough to draw on the ceiling.' To a friend whose drawer was jammed day after day, he suggested: 'Think that you are tugging a fellow-creature out of an Alpine crevasse.'

Spontaneity is Chesterton's forte. This inimitable quality redeems many of his compositions, soaring in concept and, perhaps, obscure to the layman. The most outlandish of his ideas are pertinent to a measured degree. His down-to-earth sprees are succinct, but never staccato. A thoughtfully sifted finesse softens the crude contours of his bursting picturesqueness. 'The

colossal contours, soft and strong,' of the Sussex downs remind me that 'the mighty are merciful'. At the end of an 'ashen' autumn day, he sits despondently, 'watching the last tail of the tattered sunset and listening to the everlasting rain'.

G. K. is perhaps unprecedented in the way he displays a compromise, a legitimate half-way house, between unrestrained emotion and polished decorum. In his maddest moments, he is also the correct refined litterateur. It is this exquisite blending of the opposites that he points out as the medium in which our unrehearsed meditations are to be flaunted. Shunrodomontade, Chesterton insists, but do not, under any circumstances give up beauty when putting into words the language of your heart.

There is, however, one warning: Chesterton's economy with words is almost poetic, though he never leaves a thing unsaid. His is a creed of 'say it well, say it short, say it easy'. No stilted embellishments, but crisp, reminiscent outbursts, crowd his variegated contributions. His nostalgia is infectious; one is unwittingly stirred into the recollection of drifting memories. G. K. has neither the abstruse abruptness of Joyce, nor the acute nausea of Zola's abandon—he is more of a Tagore or a Rolland, a sprightly easy-going realist who finds much to be amended, but feels no vehemence with life as it is. He is at peace with the world and its delightful nothings: his war is against established niceties.

Call him great? Then listen to his terse, after-dinner self-exposition—'I'm not really so large; I'm being amplified by the loudspeakers here.'



To Wit and to Woo : Mr. Thurber's Wonder-World

HIREN GOHAIN

Third Year, Arts

'Have you lost your way, Sir?' said the dancing boy.

'All paths,' the Philosopher replied, 'are on earth, and so one can never be lost—but I have lost my dinner.'

The Crock of Gold, James Stephens.

Anyone who has seen Mr. Thurber's drawings must have realised that here is a humorist with a difference. Those incongruously melancholy faces, perched on incredibly globular figures, make him pause, and perhaps, ponder. If this chance admirer ever strays into Thurber's writings, the first vague impressions will doubtless solidify into an awareness of Thurber's peculiar genius. For, James Thurber is one of the foremost fantasy-makers of our age. He has added a fresh genre to the already enormous stock of humorous literature—no mean achievement if we consider how thoroughly the possibilities of newness in literature have been explored of late.

I do not suppose that the current craze for fantasy in American literature is a mere accident. A typical representative of this trend is Ogden Nash, whose cranium teems with such novel problems:

The trouble with a kitten is that
It eventually becomes a cat.

The streamlined American way of life strains at the average American's nerves until they are stretched to the breaking point. And, while some find relief in running berserk, there are few who go the whole length of such a radical departure. Indeed, to the great majority of docile city-dwellers, life is a dreary and monotonously repetitive programme, which affords them no sense of security, no sanctities to sentimentalise about. The savage, blood-curdling writings that pour out of the American press nowadays reflect, in a measure, the emotional reaction to such an existence. For a fairly recent sample, you may turn to J. D. Salinger's 'Catcher in the Rye.' Whether this meaningless maundering on life in the new Babylon holds the mirror to a decaying society or not, need not concern us here. But it seems incontrovertible that a spirit of disenchantment is in the air. We suspect

that this has something to do, with the tendency towards fantasy—building in America.

'Fantasy?' you ask, patronisingly. 'Well, why not? Let's have a look at the "dong with the luminous nose," or hunt some "snarks" in "the land of the jumbies".' But, strange though it may seem, the modern fantasy-maker does not hold out such Victorian golden goblets. His fantasy-making is so urgent in tone, so fiercely insistent in its demand for an audience that a blissful momentary return to childhood is no longer possible. Rather is he a frightened, bewildered individual beating a frantic retreat from the hideous, work-a-day world. We should not blame him if there is no child-like charm in his business. But alas! Should we also condone the obvious fact that, for one thing, it is a potent cause of the fabulous currency of horror-comics?

The amazing array of humorists in contemporary American literature reflects just such a nation-wide hunger for relief from reality. And, if fantasy, when burdened with a lack of humour, can be equated to the nightmares of a nervous wreck or to purest megalomania, it has, when graced with a sense of humour, a fair chance of finding a back-door entrance to wisdom.

A sense of humour does not always imply a rollicking, horsy spirit. This elusive faculty often comes within an inch of 'the tragic sense of life'. Here I should like to make a reservation. I often come across people making outlandish claims for the sense of humour. It is, for instance, declared to be 'the other side of realism'. There is, no doubt a modicum of realism in humour. The genuine humorist sniggers when he sees someone leaping for the highest rungs of the social ladder and falling back on the ground to break his shins. The horror of the thing—perceived in the light of undiluted realism—is enough to shake the breath out of the most robust lungs. But the humorist is a kindly man, disillusioned perhaps, but emphatically free from rancour. He looks at human follies like a warm-hearted adult, consoling a child who is shaken by a stumble.

Then, what about Swift—in the feeble light of whose old age, even a 'rational' horse seemed better by far than man, 'a poor, bare, forked animal'? Here, one must suggest that this merciless flaying has plenty of dross mixed with genuine humour. We do not read Swift with a smile, but with a bitter taste in the mouth. Likewise, even the 'My Ford!' of Aldous Huxley's 'Brave New World' fails to lighten the gloom of a world where babies are conditioned and virtuous students of pathology blush to utter that horrid obscenity—'parents!' This, I believe, is the penalty of an all-absorbing intellect. Thurber is, fortunately, a more genial soul. Yet, he, too, extends his charity only to the hyper-frustrated victims of modern life. This characteristic he shares unexpectedly with the other great authors of the American tradition—Sherwood Anderson, for example,

At the opposite pole stands the humorist whose stock-attitude is self-mockery. Stephen Leacock, the great Canadian writer, may well be taken to represent this trend. Thurber, too, is conscious of his inferiority, but this consciousness is not, with him, a mere attitude. *Rather is it so deeply ingrained that he need not flaunt it in his writings.* We do not laugh superciliously at the sorry figure who is supposed to represent the author. *Instead, we feel an overwhelming pity for the suffering fellow.*

Indeed, it is for the wandering human figure, standing alone and bewildered in the shadow of our skyscrapers, groping his way through an estranged, urban world that Thurber reserves his deepest sympathy. One cannot enter into the mood of his rain-drenched evenings with their dripping neon-signs, skidding buses and ghostly passers-by without experiencing a serious upheaval in one's scheme of values. For Thurber projects on to a contemporary plane one of the perennial problems of American literature from Melville's 'Moby Dick' to Hart Crane's 'The Bridge'—the problem of human destiny in an alien world.

The men and women we meet in Thurber's stories are not the rounded, full-blooded characters of the classics. They are cut-outs, caricatures drawn in the flat in a world before perspective. But he insists that this is Reality, and that what we are accustomed to take for the real is pure illusion. Thurber is not a puckish spirit who looks at us, blundering human doddards, to exclaim 'Lord! what fools these mortals be!' But his sense of the ridiculous is as keen as Dickens's.

I sense an inverted craving for peace and order in Thurber's writings—as if he is oppressed by the modern tendency towards chaotic complexity. Bald, middle-aged men, with the scanty remnants of a black harvest lingering on the shining convexity of their heads, are seen sunk in reverie. Corpulent and irate women, with no more than knobs for noses, keep them company, while trying to manage balls of wool. Besides, there are other worthy companions—drowsy dogs and complacent hippos, hermit-crows and irrepressible seals. Even his animals reflect Thurber's yearning for peace, repose and meditation.

There are other cartoons, too, which defy all attempts to unravel their meaning. The surrealists claim that these are drawn from the subconscious and betray Thurber's debt to their ideas. Thurber himself is discreetly silent on this point. These cartoons are pure fantasy, irrepressibly and absurdly funny. An editor with a rabbit's head on his shoulders faces a stunned woman in one of them. Scribbling on a piece of paper, he asks in a properly editorial manner, 'You tell me, Mrs. Zending, that I have just turned into a rabbit?' In another, a seal peeps from behind a bedstead while an irate wife rails at her husband, 'You! You with your seals and hippos! Won't you let me have a wink of sleep?'

Yet, despite these flights of fancy, Thurber's characters live the modern life with its sleeplessness and nightmares, its boredom and strain, and its

vague, uneasy fears. His is the world of the husband martyred by a wife who insists upon his accompanying her to lectures and classical concerts. His also is the world of the harmless fellow who is afraid to go out-of-doors because he is said to resemble a notorious gangster. Look for a wild, middle-aged, venerably bearded doctor, bolting breathlessly from an imaginary deluge, firm in his conviction that the waters are only a few paces behind him. This—as Thurber recalls solemnly—was the only occasion that found the doctor exercising his leg muscles.

All in all, Thurber's 'Fables for our Time' explore a novel technique in the realm of humour. Apparently following the tradition of Aesop, they preach morals conditioned by our changed times. The element of fantasy is sustained with infinite dexterity. A delightful harvest of puns and parodies awaits the reader. In one of his fables, the secretary-bird struts up to the owl and declares, 'Mr. Owl, I have some mighty questions in store for you.'

'To wit?' Mr. Owl condescends to respond.

'For a sample, why on earth do you keep indoors all day long?'

'To woo!' is the triumphant reply. The secretary-bird retreats, much abashed.

Mr. Thurber, I am convinced, represents—whether in pure fantasy or in weird visions of life—the very best in modern humour. It is, I think, reasonable to conclude that he will continue to delight future generations like that merry immortal, Lewis Carroll.

The Victorian Temper

INDRANI GUHA

Sixth Year, Arts (Outgoing)

It is a commonplace of criticism that the literature of every age represents a reaction against that of the preceding period. This, nevertheless, is a most apposite starting point for an attempt to analyse the spirit of Victorianism. For, only in the perspective of the Romantic era can the distinctive features of Victorian literature be studied to advantage. A digression into Romanticism is essential for any understanding of the Victorian temper.

Hulme has sought the essence of Romanticism in the cult of Man triumphant. Prometheus, defying the thunderbolts of Jove on the Caucasian mountain, has, for him, always been the prototype of the Romantic. For, indeed, the Romantic era was one singularly fitted to foster humanistic values. The French Revolution and the Greek war of independence sustained man's faith in his own perfectibility. Man was the fallen angel; he was fashioned in the image of God—a belief that was the occasion at once for a robust optimism and a wellnigh fanatical devotion to the lost Paradise. Man, it was claimed, was born free, but everywhere he is in chains, and it is our duty to recover for him his alienated birthright. Hence the insurgent note of protest in Romantic literature. Tempered by the fiery baptism of the French and the Greek revolutions, Romanticism was thereafter in instinctive rebellion against the imperfections of the existing social order. It was a revolutionary and an optimistic creed. Even more, it was an uncompromising and an unmixed one; it offered a unique utopia and suggested a unique solution for all our problems. It excited, accordingly a mystic and emotional intensity of belief: the pure flame of single-minded faith burns bright in Romantic literature from Rousseau to Shelley.

This clarity and simplicity of vision, unfortunately, could not survive the changing times. The Victorian age was a complex era with its diverse and conflicting inspirations, its shifting cross-currents of thought. Predominantly, it was a confused and a divided age. Optimism had, by the mid-nineteenth century, become the monopoly of the philistines; the Benthamite faith in progress through science and the economics of *laissez-faire* was now, no doubt, the cornerstone of bourgeois morality. But to the sensitive conscience of the artist, it appeared to be overtly contradicted by the misery begotten of the Industrial Revolution. In the light of mechanistic science—of astronomy and anthropology—man had dwindled from the stature of a God into a clod of common clay, thrust by accident into an alien world, infinite

in its immensity as compared with his puny figure. Darwin had, once and for all, quenched the divine spark in man: the descendant of the anthropoid apes could no longer claim to be the inheritor of the lost Atlantis.

As faith in man was undermined, the futility of revolution came to be realised. To the Victorian, the industrial order is hateful, but protest is pointless, since this order is the logical outcome of man's evil nature. Hence the infinite melancholy that broods over Victorian literature. For, if the Romantic agony was the fruit of devotion to a Utopia which one believed to be attainable, the Victorian's was a deeper anguish; it was the sadness of one committed inevitably to an order which one despised. The sense of the lateness of time, the weariness of spirit, the burden of fruitless experience lies heavy on the Victorians from Tennyson and Arnold, lamenting 'the iron time', to Dickens, Moore and Gissing, portraying the sordid but inexorable facts of urban life after the Industrial Revolution.

In this sense, Browning's response to his environment was unique and individualistic. Browning's optimistic vision is not clouded by any consciousness of evil. Evil deeds, in his philosophy, cancel each other out, so that while

'God's in his heaven,
All's right with the world.'

His poetry, accordingly, is not pitched in the plaintive key of an age which has lost faith in itself.

Browning's deeply spiritual resolution was not, unfortunately, open to most of his contemporaries. And, for them, the consciousness of the inevitability of evil meant a paralysis of action. It sapped the sources of their spiritual energy, leaving them in attitudes of listlessness—the resigned stoicism of Tennyson and Arnold, or the ironical detachment of Thackeray. It encouraged the artist to escape from the plane of social existence with its insoluble riddles to the isolation of the ivory-tower; in this, it was the stimulus to the pre-Raphaelite conversion of art into a cloistral cult, culminating in the pure art for art's sake of the *fin de siècle*. It even lent a note of wistful pathos to the projection of the typically Victorian Utopias to which, according to the bourgeoisie, science and democracy were to lead us; even Tennyson, dreaming in 'Locksley Hall, Sixty Years After' of 'a Parliament of man, a Federation of the world' was aware, however dimly, that he was not blueprinting the future of mankind, but merely giving to airy nothing a local habitation and a name.

The industrial civilisation, as it evolved in nineteenth century England, was not, of course, accepted without demur. Ruskin, the apostle of 'sweetness and light', waged his futile war on an utilitarianism by which God was Mammon and the ultimate values of life were determined by the calculus of economic profit and loss. Yet Ruskin's solution—the restoration of the

benevolent-patriarchal society of the past with the humane wage-relations of the small workshop system—was essentially Utopian: it bequeathed to the future a co-operative ideal, without weaving it into a satisfying ideology, appropriate to time and tide. This failure to evolve a feasible alternative lent to Ruskin's protests a thinness of timbre, a still, small falsity of intonation, which deepened, where it should have dispelled, the Victorian gloom.

The Victorian era was, thus, the age of despair and of the inaction born of despair. Even more, however, it was the age of uncertainty. It had failed to work out a coherent philosophy amidst the conflict of mechanistic science and utilitarian economics with the humanistic ethic. For the Victorian thinker, the rejection of the one meant foregoing the benefits of science and democracy, the sacrifice of the other implied the repudiation of the time-honoured heritage of the European Renaissance. A single scheme of collective values is lacking; the individual's impression is one of spiritual disintegration, of deep-seated doubt where conviction had once reigned. To the Victorian writer, as to Auden,

Man has no mean: his mirrors distort;
The greatest Arcadias have their ghosts, too;
The Utopias tempt to eternal youth
Or self-slaughter.

Merlin following the gleam, oblivious of all else, is, indeed, the embodiment of the wistful yearning of the Victorian soul, divided against itself, for unity of purpose, for a lost harmony of emotional conviction amid a gnawing awareness of the duality of things.

This, perhaps, explains why the fine poetic frenzy, the emotional fire sinks in Victorian poetry to so low an ebb. Tennyson, Arnold, the pre-Raphaelites (save, perhaps, D. G. Rossetti), even Swinburne with all his erotic excesses leave us cold. For, emotionally they are dilettantes: they lack the intensity, the spiritual absorption that comes of passionate faith.

This equally is the reason why Victorian poetry is so largely a harvest of moods and moments. The Victorian poet has no structural energy because he cannot think of life as a coherent whole. But if the brittle crystal of a unified vision of life has been shattered, the poet can now dwell delighted on the glittering facets of each separate splinter. Tennyson, for instance, has no peer in English literature in the rendering of moods, the evocation of isolated experiences. And Swinburne can capture the sensations of the stray moment with an accuracy as flawless as that of Victor Hugo's songs, which, in Swinburne's own exquisite words,

Or fell more soft than dew or snow by night,
Or wailed, as in some flooded cave
Sobs the strong broken spirit of a wave.

Not all Victorians, however, could rest content with repining for a vanished faith. Their reaction to the spiritual vacuum which was their inheritance was the inculcation of the doctrines of action—

There's not to make reply, there's not reason why,
There's but to do and die.

To achieve this, they were even prepared to 'divorce old barren Reason from their beds', to consciously cultivate dogma as the only outlet from a paralysing scepticism. There was, for instance, the imperialism of Kipling, based on the dogma of 'the white man's burden'. On an entirely different plane, there was the Oxford Movement, the Catholic revival which sought in authoritarian values, in the discipline of Roman dogma, a relief from the burden of fruitless rationalism. Above all, there was Carlyle. For Carlyle, the moral dilemma that beset the other Victorians—the choice between Christian values and the materialistic cult of science, and democracy—did not exist. He had rejected in toto the materialism of the utilitarians and the mechanistic scientists; he sought in German transcendentalism a spiritual interpretation of the material universe as 'the mere vesture of the divine reality.' He even repudiated that most sacrosanct of Victorian ideals—the democratic freedom that 'broadens down from precedent to precedent'—installing in its stead the paternalism of hero-worship. The spiritual testament of the Victorian era enshrined, strangely enough, the creed of latter-day Fascism.

In rejecting the current social order, then, Carlyle went to the length of repudiating the ideals which had become an accepted part of the Victorian heritage. His was far too radical a solution for the spirit of the age. Harmony, hence, was never established between the varied trends of Victorian thought. The Victorian remained, to the very last, a frustrated individual striving in vain to find his poise in the scheme of things.

Whither Communism

PRANAB KUMAR BARDHAN

Fourth Year, Arts

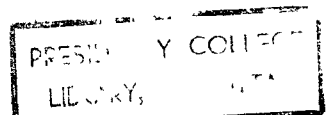
[Written on the occasion of the 40th anniversary of the Russian Revolution]

It was in March, 1954 that Krushev as a fraternal delegate to the 2nd Congress of the Polish Communist Party stood with other delegates in silence to commemorate 'the immortal memory' of Stalin. It was February, 1956 when Krushev had performed the task, at least on the official level, of placing 'the immortal Lenin' on the pedestal from which Stalin had been knocked down, and there was none so poor to do him reverence. The 'thaw' had set in. Krushev's picture of the Soviet Union between the assassination of Kirov in 1934 and Stalin's death in 1953 'bears a startling resemblance to the more lurid efforts of the extreme anti-Communist school' all these years. In the maelstrom of tyranny that lasted for twenty long winters, one man terrorised 200 million people, and helpless Krushev danced when ordered and murdered as ordered. Heroically enough, he along with his colleagues who found themselves alive, waited for the monster to die. And when their turn came, they started their blitz *à outrance* against the dead tyrant (in the fashion of the English royalists who hanged Cromwell after his death), with the fond hope that their own part in the twenty years of nightmare will be overlooked in thankfulness that it has ended, and 'that they will be able to go ahead untrammelled by the discarded garments of their past.'

The Renaissance of Leninism

The Twentieth Congress, despite all that, has set a milestone in the halting evolution of post-Stalin Communism. The cult of the individual was shattered with a vengeance, giving place to the Leninist system of collective leadership. Much of the ideological junk of Stalinism 'which had stultified Communists at home and abroad for so long' was thrown overboard. Many of the victims of Stalin and Beria were rehabilitated and some even recalled from the house of the dead. And there was a general

* Contemporary Communism, is indeed an arresting topic for the political casuists. I am not, by any chance, one of them. A full prognosis is understandably far beyond my competence. On the communist question, as one commentator laments, there are no experts, only degrees of ignorance. The present article will serve its purpose if it gives a bird's-eye view of the picture from a sympathetic but essentially non-Marxist angle.



alleviation of the tensions and fears of the Stalin regime. This process of de-Stalinisation—in social and administrative reforms, industrial and agricultural reorganisation and in ideological revision—was engineered by the neo-Leninist group (and partly also by the economic reformists or the so-called Malenkovites) which was—and is—gaining increasing importance in the ruling strata and whose aim is to revive old Leninist ideas in the context of the mid-twentieth century. The process was however not at all smooth. Off and on Stalin's ghost would shake its gory locks at Khrushchev.

Under Stalin the whole industrial machine of the country groaned under the stupendous load of bureaucratic over-centralisation. Since 1955, a policy of diffusion of economic power is being steadily followed. In 1953, at the time of Stalin's death, 69% of all industrial production in U.S.S.R. came from centrally controlled factories and the rest from Union-Republic factories. At the end of 1956, the respective figures were 45% and 55%.¹ And if the recent Khrushchev plan for an economic overhaul is faithfully carried out, we may very well expect a kind of industrial federalism in Russia on the Leninist pattern of 'democratic centralism'. In the scheme of horizontal reorganisation of Soviet industry, a number of Regional Economic Councils (which Stalin had abolished) are to operate under the co-ordinating influence of the *Gosplan*, the supreme planning authority. There is thus the indication of a welcome change in the very structure of Soviet planning, and a greater scope is now being given to local initiative and planning from below. Economic decentralisation, however, would be but one small step to de-oligarchise the bureaucracy.

The Apotheosis of bureaucracy

Khrushchev fails to see that it would be merely 'the cult of personality in reverse' to ascribe all the evils of the former regime to a single man. The sociologist sees Stalinism and its growth as a historical process determined by objective circumstances. Overcentralisation, total *statism*, 'bureaucratic deformism'—all these are to be explained by the feudal backwardness of the environment in which the first 'workers' state' had—un-Marxianly—set out to build Socialism. Marx conceived of the Socialist revolution as a historic process to be brought about by the proletariat—'the immense majority' of the population—of a fully industrialised bourgeois nation. "Lenin, on the other hand, sought to engineer a socialist revolution in an industrially backward country through the *coup de force* of a determined band of revolutionaries, organised in a highly centralised and semi-militarily disciplined party."² Thus the October Revolution, as it is said, defied in its own way history's 'law of gravitation', as much as the Soviet scientists to-day

¹ *Kommunist*, 1957, No. 3.

² On this point of difference between Marx and Lenin regarding the nature of the proletarian struggle, see John Kautsky's article, *From Marx to Mao* (Soviet Survey, July 1957).

are trying to overcome the earth's gravitation. History had its revenge as Russia was driven to establish instead of a plebeian democracy the most ruthless type of the dictatorship of a bureaucratic oligarchy ever known. This *new class* of bureaucratic rulers, as Arthur Koestler complains in his *The Yogi and the Commissar*, is following the history of 'all self-perpetuating groups': Socialism is thus being bogged down in a regime of entrenched privilege.¹

So Stalinism lingers . . .

Many other undesirable features of the Stalinist System, especially forced collectivisation and excessive priority for heavy industry, are still there. That twenty-five years of collectivised agriculture have failed to attract the vast peasantry is a pointer to the belief that an independent peasantry is potentially an enemy of the Communist regime.² The economic history of Soviet Union has been and still is one of stubborn conflict of interests between the industrial workers and the peasantry, thus giving lie to the Marxist postulate of an automatic harmony of interests between the proletariat and the rest of society.. Another persistent feature of the Soviet, and for the matter of that any Communist economy, is the disproportionate concentration on heavy industries—an unbalanced planning, as it is called. It was only for a short spell that Malenkov could pursue his consumer-goods policy. On 24th January, 1955, *Pravda* came out with a sensational article which denounced the Malenkovite economists as 'vulgarisers of Marxism'. This article spelled the end of Malenkov's 'New Course' and was the prelude to his fall.

Euthanasia of enthusiasm

The *Volte-face* in Kremlin was followed by the eruption of the pent-up forces of criticism. Once given the green light, public criticism soon tended to flow in forbidden channels.

People began to ask questions about the whole system itself, which the Khrushchev pattern of de-Stalinisation has left basically untouched. The Frankenstein was raising its head. Hastily did the ruling cabal decide to soft-pedal the new process. In two *Pravda* articles (on 16th and 24th July, 1956) the positive achievements of the system—even under Stalin—were

¹ See the excellent article of Milovan Djilas on *Marxism in a changing world*.

"The actual establishment of a Socialist Society"—Trotsky warned the Communists twenty years back—"can and will be achieved, not by these humiliating measures of a backward capitalism, to which the Soviet government is resorting, but by methods more worthy of a liberated humanity—and above all not under the whip of a bureaucracy . . . This whip . . . will have to be broken in pieces and burned at a public bonfire before you can speak of Socialism without a blush of shame."

² Marxism, in the ultimate analysis, is an urban creed.

stressed again. The tightening of control was intensified after the Polish and Hungarian events. The Retreat started.¹

The god that failed

After forty years from the Revolution, Soviet Russia—from the shores of the Arctic to the Pamir—presents before us a horrid spectacle of paralysing uniformity. Russian Communism, at least, has failed to create a new world, a new civilisation and a new man. The Revolution indeed stands betrayed.

Behind the window-dressing of monolithic unity and unanimity there is ferment and discontent all around. Through modernisation of the economy and by raising the living standards of the people the Soviet leadership is today trying to dangle the carrot as it had previously brandished the stick. But how long will the people be content to live by bread alone?

New Horizons

So 'to kinder skies, where gentler manners reign' we turn—where the Red Star shines on the Eastern horizon, where Communism, under the ideological and practical guidance of a great leader, Mao-tse-tung, is breaking new paths. Chairman Mao's February address on *The Correct Handling of Contradictions Among the People* is indeed a New Testament for Marxist theory and practice. For the first time the leader of a Communist country came out with the glorious confession that even in a supposedly 'classless' society 'contradictions' among the people may exist and legitimately so.² It is to be appreciated in the context of the development of Marxism in other socialist countries, especially in Soviet Russia. The Marxian dialectical logic—if it is any logic at all—transformed the liberal hedonism of the nineteenth century into a collectivist materialism which gave the ideology a definite absolutist bias. The individual was somehow fitted into the Procrustean bed of a class and was asked to believe in a unity which nobody found there save the glib parrots of Marxist phraseo-

¹ See W. Leonhard's article, 'Return to Stalinism in the U.S.S.R.?' in *International Affairs*, July 1957.

It seems that de-Stalinisation, to Khrushchev, does not mean 'liberalisation', at least in the sense that many Hungarian, Polish and perhaps even Soviet intellectuals took it. It only means the modernisation of the party machine and the restoration of the supremacy of the party. For, the Leninist group, which Khrushchev leads against the none-too-weak conservatives and technocrats, sees the Communist Party—not the police or the State apparatus—as the spine of Soviet society. It may be interesting to note that Molotov, Kaganovich and Malenkov were expelled from the Central Committee on the alleged ground that they had formed, as the *Pravda* editorial of 3rd July, 1957, called it, 'the anti-Party group'. More recently, the expulsion of Zhukov—with a dramatic suddenness that is only typical of iron-curtain mysteries—probably means that the rise of an over-mighty army leader is a threat to the direct control of the armed forces by the Communist Party. The pity of the whole affair is that while these show-downs are taking place on such Olympian heights, the people of this vast country are—at least it seems—but helpless onlookers.

² Mao originally took up the subject of contradictions in his essay 'On Contradiction' written in August, 1937. See his *Selected Works*, Vol. I.

logy. The Communist party, we were told, represented the unified interests of the 'classless' Socialist society; to go against it in any way was a 'counter-revolutionary crime' which must be suppressed at any cost. Thus was raised the Stalinist fetish of the 'monolith' and the totalitarian Leviathan on the Czarist throne.

A reign of terror was let loose to prop up an exhausted dogma and its paranoic Godfather. Even after his downfall—and what a fall was there!—the new leaders were more eager to show their posthumous hostility to the *bête noire* than to revise the dogma itself. That task was taken up by Mao. He came out with the declaration that the 'non-antagonistic' type of contradictions between the Peoples' Government and the people themselves is to be given a leeway of legitimacy so long as it does not endanger the basic socialist structure.¹ The divergent interests of the working class, the peasantry, the bureaucracy and even the 'national bourgeoisie' are to have a coexistential interplay—Rosa Luxemburg's 'free struggle of opinion'—within the sacrosanct periphery of socialist construction.

The Floral coexistence

Mao has thus tried to bring Marxism out of the 'hothouse protection' of Stalinist orthodoxy into the open air flower garden of ideological coexistence. "*As a scientific truth*", he asserts, "*Marxism fears no criticism, If it did and could be defeated in argument, it would be worthless Marxism can only develop through struggle; and this is true not only of the past and present—it will necessarily remain so in the future as well. What is correct always develops in the course of struggle with what is wrong.*" How long have we not heard such challenging vigour in a Communist voice!

Mao thus brings about a revolution in the whole concept of proletarian dictatorship and attempts with all sincerity to detach Socialism from its totalitarian shell. And as Isaac Deutscher observes, "the Leninist idea of a transition to Socialism through N.E.P. is given its first practical and gigantic test in China; in Lenin's own country, it was never applied."² Accepting the 'inevitability of gradualness', Mao proceeds to build Socialism within the framework of a mixed economy, in which the socialist sector expands 'peacefully' but steadily without causing those cataclysmic collisions which Stalin had made against the peasantry and the 'Kulaks'. Collectivisation of farms in particular, is progressing in a slow and subtle way as to avoid the 'rightist errors' of the Bolsheviks, and in industrial policy, the Chinese leaders, wiser by the painful experience of their Russian brethren, are now giving

¹ Mao, however, lays down 6 criteria for the legitimacy of criticism, the most important of which is that the leadership of the Communist Party and the validity of the socialist path should not be disputed. So one is not still sure of the process by which, despite good-meaning Mao-tse-tungs, in the communist botanical laboratory 'flowers' may turn into 'weeds'.

² See Deutscher's excellent article on *The Doctrine of a Hundred Flowers* in *The New Statesman and Nation*, June 29, 1957.

greater weight to consumer interests. As regards his labour policy, Mao, following the Leninist principle,¹ has recognised the workers' right to strike, a right which, for nearly 35 years, has been denounced in their 'fatherland' as a counter-revolutionary crime. In the intellectual sphere, the 'hundred flowers' policy definitely implies that artists and writers in China are no longer required to look upon things through the distorting mirror of dialectics and that 'socialist realism' is no more to throttle creative expression as had been the case in Stalin's Russia. Now that Socialism has been basically established in China, Mao is today eagerly trying to mobilise the willing co-operation of the bourgeoisie, the peasantry and the intellectual class in China's social and economic reconstruction. To get closer to the masses,² a *cheng-feng* movement has been launched within the Party, which, according to the directive issued by the Chinese Communist Party's Central Committee on 27th April, 1957, is 'an extensive thorough-going rectification campaign against bureaucracy, sectarianism and subjectivism, to raise the Marxist ideological level of the whole Party and improve the working style so as to conform to the needs of socialist construction.'

Another independent citadel

Since the 1948 break with the Cominform, Yugoslavia is evolving its distinctive pattern of Marxism-Leninism, its own socialist dialectics and its own system of political and economic organisation. 'The Yugoslavs' Marxism is born out of their needs, out of their history, out of the thirst of the South Slav for a home and of a future which must be their very own.'³ With the introduction of workers' councils for factory management, the relaxation of agricultural collectivisation, the decrease in the activities of the secret police and of the bureaucracy, the reduction of federal control in the government reorganisation of April, 1951 and in subsequent measures of decentralisation, Yugoslavia is moving towards a more humanised and less rigid form of Communist government.

The withering away of the state or 'organised violence', and the establishment of a society in which 'the free development of each is the condition for the free development of all' has long been the dream of the imaginative Marxist. But the infernal persistency with which the fatherland of the proletariat has until now followed a policy of perpetuating the 'transitional dictatorship' has once more exposed the Marxist 'illusion and reality'. Yugoslavia, however, seems to be the only socialist country that is aware of the ultimate anarchism to which she is ideologically committed and

¹ Lenin declared that "the workers are bound in duty to defend their State, but they should also defend themselves against their State."

² The walls of Peking"—said Chou-En-Lai (reported in *People's Daily*, 26th April, 1957)—"are high and could separate the leaders from the masses."

³ I am much indebted to a fine account of the recent developments in Yugoslavia by Mahesh Chandra in the *Statesman*, Aug. 29, 1957.

towards which she is now groping, however painfully slow the transition may be.

Through workers' self-government in industrial enterprises, Yugoslavia is trying more and more to diffuse the economic functions of the government and to render extensive central interference gradually superfluous. The executive functions of the government are now being shifted to elected bodies, territorial and functional.¹ In the scheme of syndicalist socialism, the Yugoslav Communist Party and the larger Socialist Alliance will have a leading role, educating the masses in socialistic consciousness and assisting the self-governing workers to arrive at right decisions. A greater democratisation is being practised within the Party and some newer lines are expected to emerge at the Seventh Congress of the League of Communists to be held in November. But the Yugoslav leaders are not yet prepared to accept Djilas's proposal² of a change in the one-party structure itself, and the whole system is still tilted towards dictatorship.

The tremors in the Satellites

One sharp deviation from the past at the historic Twentieth Congress of C.P.S.U.—and the one most fraught with dangerous consequences for the Soviet hegemony—was the thesis of differing roads to Socialism³: that 'questions of internal organisation, of different social systems, and of different forms of Socialist development are solely the concern of individual countries.'⁴ Soon did the Kremlin seismograph anxiously register the disturbances of the subterranean forces so long imprisoned within the petrified Stalinist mould.⁵

The Gomulka way

Poland was one of the first countries to be rocked. The land was swept by the flood of popular criticism. Now that Beirut—Poland's little Stalin—was dead (by March, 1956) the Polish people found it easier to express 'their suddenly remembered distaste' for the negative aspects of ten years of Communist rule. The economic demands of the underfed working class burst forth in the Poznan riots (28th June, 1956). The myth of proletarian support for the Communist regime was once more exploded.

The orgy of self-flagellation continued unabated despite Moscow's repeated warnings and Mr. Ochab's notes of alarm. The old Party hacks,

¹ Those interested in 'the working of decentralised economy in Yugoslavia' may see with profit *The Radical Humanist*, 7th April, 1957.

² Milovan Djilas, the former Vice-President of Yugoslavia, is now in jail because of his 'democratic heresies'.

³ It was on this point that Stalin had expelled Tito's Yugoslavia from the Cominform and suppressed Gomulka in Poland, Rajk in Hungary and Kostov in Bulgaria.

⁴ Quoted from the Soviet-Yugoslav agreement of 2nd June, 1955.

⁵ Perhaps Russia now finds that Satellites *over* the earth are far more docile than satellites *on* the earth.

along with their Kremlin overlords, looked ruefully as the 'managed catharsis' went on, culminating in the October upheaval and Gomulka's triumphant return to power. Since then Gomulka has been pursuing 'Poland's national road to Socialism' in the teeth of constant opposition from the conservative Stalinist faction, the so-called Natolin group, challenging the 'October line', and also from the more popular but less organised 'revisionists' in the extreme left, clamouring for greater liberalisation. For the present the Gomulka way has been directed towards three major lines of development: the introduction of workers' councils, increased administrative autonomy on the local level and greater freedom for the peasants in the choice of their methods and the organisation of their production, with, of course, an emphasis on encouraging co-operation. On the question of democratisation Gomulka is not, however, prepared to go far. In the 9th plenum of the Polish United Workers' Party, he, in reply to an article by Kolakowski (published in *Zycie Warszawy*, 3rd Feb. '57), declared that in the existing circumstances the emergence of bourgeois political parties would 'create a threat of the revival of capitalism and of civil war'. 'Can you believe', he asked, 'that this would consolidate our western frontier? . . . One may risk a few *Zloty* on a lottery, but no responsible Pole could subject the fate of Poland, to a lottery called . . . the free play of political forces.'¹

In spite of all that, the Poles today perhaps enjoy a greater freedom than many of their comrades in the other Eastern European States. 'So far as expression of opinion is concerned', a recent observer comments, 'Poland today is one of the freest countries in the world'. Revisionists and dogmatists, the organised Catholic church under the nationalist Cardinal Wyszynski and its antithesis, the 'PAX' organisation of Boleslaw Piasecki regarded by many as Stalinist, believes in parliamentary democracy and votaries of proletarian dictatorship, all can and do raise their voices. The Polish Parliament has come alive. Non-Communist parties have regained some of their independence. So far as arts and literature are concerned, it was proclaimed by Premier, Mr. Cyrankiewicz sometimes back: "Let the new period be characterised by freedom of creation. Let nobody be afraid of bold and creative 'ferment'. Let nobody restrict his horizon." Poland has thus deviated considerably from the current Moscow interpretation of Marxism-Leninism. With a political realism that is so tragically rare among Marxists, Gomulka is now trying to secure the willing co-operation of all sections of the people in the country's economic revival. And as Deutscher observes, the social reality of this economic development is most likely to create and infuse among the people more demands for goods and ideas. So if the current policy of liberalisation is only the application of the classical Leninist tactics of '*reculer pou mieux sauter*',—then Gomulka is surely

¹ This was particularly in reply to Kolakowski's statement that 'democracy is a risk, but a risk worth taking'.

playing with fire. Since last October, the Poles have been awakened to a fervid consciousness that would never allow any one to put the clock back.

The Blood-bath of Budapest

Since the Bolshevik *coup* of 1917, Marxist visionaries all the world over had had many rude jolts. The rudest of all, in recent times, has been the Hungarian tragedy. After the end of the Fascist regime, Hungary under Zhdanovist absolutism had evolved into a total *Gleichschaltung* to the Soviet system. In a country with Western traditions and civilisation, when the Communist authorities could not adapt themselves to the challenge of an alerted and powerful public opinion, the result was revolution. Despite fascist participation and American help, it was basically a popular revolt. People clamoured for a 'neutral, independent, democratic and socialist Hungary': the Soviet tanks thundered in reply.¹

Mid-twentieth century Marxism took 25,000 lives as the price of a 'counter-revolution', and the imposition of Kadar—the appointed 'saviour' of Hungary—was imperialism's final answer. Quiet flows the Danube as Communism thus digs its grave.

'Ils n'ont rien appris ni rien oublié' ?

Stalinists are still going strong in the satellite states of Albania, Bulgaria, Rumania, Czechoslovakia and East Germany. But the impact of the Twentieth Congress has not been totally lost even in these countries. The Rumanian leadership, for instance, is today trying to effect some changes, however mild, in its past attitudes and policies. Since the last elections in February, Rumania has been introducing a greater measure of decentralisation and workers' participation and a greater stress on local initiative: the management of nearly 4,000 enterprises has been placed under local Peoples' Committees. The imbalance between industry and agriculture is also being slightly corrected. In the field of agriculture, however, though compulsory levies have been abolished, collectivisation is still being pursued ruthlessly, covering, as it does, 30% of the total land area. As one observer has summed up, 'in the evolution of Marxist theory, Rumania is still backward'. The same is true of the other ossified regimes in Eastern Europe.²

A tragic comedy of history

When in February 1956, Krushev was hammering at the colossal statue of Stalin with gay abandon, he was, unknowingly perhaps, shaking the

¹ In 1848 also there was a liberal revolution in Hungary, followed by Russian intervention. History, un-Marxianly enough, repeats itself.

² The Communist Party Chief of East Germany, Ulbricht—one of the Stalinist die-hards—has also admitted 'Serious theoretical mistakes' and contradictions between workers and private farmers (see his speech at a conference with Scientists, propagandists and party workers on May 13, 1957).

prestige of his comrades all the world over. Nothing could have placed them in a more absurd position. Krushchev and Co. have, for their past mistakes, a scapegoat in the dead tyrant, but how can the Communist in India or Indonesia—who has so long consistently performed his *gopak à la Stalin*—blot out the stain of his servility to the ex-Big Brother? There is certainly a limit to the flexibility of human backbones.¹

No more sneezing when Russia catches cold—

Thus with the recantation for which no plausible excuse could be found, with the tragic humiliation with which the comrades have now to eat their former words about the doctrinal infallibility of Moscow, disillusioned communism would, it is hoped, no longer look blindly to the leadership of Kremlin. And with that collapses the whole system of monocentric Stalinist Communism. In an interview published in the periodical *Nuovi Argomenti* on 16th June, 1956, Signor Togliatti, leader of the Italian Communist Party declared: “. the Soviet model cannot and must not any long be obligatory . . . The whole system becomes polycentric, and even in the Communist movement itself we cannot speak of a single guide but rather of a progress which is achieved by following paths which are often different” More and more, at least in Asia, a greater faith has come to be pinned on the Chinese revolution rather than its Russian parent. “The Communist movement in Asia” says Ruth Fischer², “has gained the enormous impetus provisionally symbolised by the Communist victory in Peking because, unlike European Communism, it expressed from the start the content of the Asian national revolution.”

The resurgence of Asia is firmly wedded to the twin ideals of national independence and economic betterment. And in that context, Communism seems to be an alluring mistress. The romanticism of the young generation in Asia nods heavily to her appeal. The dead-weight burden of economic backwardness, the widespread agrarian discontent, hatred of Western imperialism (especially in the explosive Middle-East), the slow and halting way of the Western type of democracy to redress the mounting grievances, the ‘revolution of aspirations’ that has come with independence—all these make Asia a very happy hunting-ground of Communism for some time to come.³

¹ A Polish periodical, *Nova Kultura*, published a letter (on 22nd April, 1956) which began: “I am eighteen. Now I find that what my family said about . . . the dictatorship of Stalin was true. I find that history was really forged. And I? *I do not know how to change my soul for the fourth time without the fear that it will become a rag.*” (italics mine)

² See her recent book, *Von Lenin Zu Mao: Kommunismus in der Banding-Ara.*

³ Communists are to-day in power in China, North Korea, Vietnam and the little State of Kerala in India. President Soekarno of Indonesia is also, we are told, of communist leanings, though he had to contend with several communist conspiracies starting with the desperate 1946 *coup* led by Tam Malaka. Syria in West Asia is also gradually coming under Soviet influence. The Eisenhower Doctrine (—Eisenhower abhors a vacuum!—) has ultimately done a greater service to Russia than to America herself.

But how long, the sceptic asks, will the uneasy marriage between the egalitarian content of materialistic Marxism and the emotive content of idealistic nationalism serve to placate the demands of a people who with their deep attachment to religion, with their fundamental individualist ethics, and with their democratic aspirations, are not in any way natural recruits to the Communist movement?

The Ultimate Dilemma

It is on the question of democracy in particular, that the whole future of world Communism vitally depends. If that is so, if the prospect for Communism is a function of its democratic concessions, then, it is argued, Communism is walking up a blind alley of history, for, in the ultimate analysis, there cannot be a *rapprochement* between Communism and democracy. The half-way house in which Gomulka and Mao choose to dwell is, we are told, a house of cards.

This is the dilemma which faces 'liberalised' communism to-day. Both Mao and Gomulka seem to allow diversity of opinion and the existence of non-communist parties which should act as real and even vigorous pressure-groups, but not as alternatives to government. If, however, these leaders do not want to take their fingers off the pulse of the people, they will have to go farther in the way of democratisation, sooner or later. Communism can and indeed must dissociate itself from the totalitarian state; if that involves doctrinal revision, it is worth taking—for all is not contained in the Book.

It may stoop to conquer

If this is achieved, if an attitude of pragmatism can be adopted, the communist would find that the real kernel of Marxism still remains intact. Echoing a Marxist slogan, we can say that the Marxists have, in this process, nothing but the chains of rigidity to lose. If the Indian case is any example, —it is only when Kerala Communism shades into Avadi Socialism, the Communists have any chance of gaining genuine popular support. In the future evolution of human society, communism in its gradual descent down the hill of liberalisation may meet democratic socialism on an even plateau in which, let us hope, the world may find its final political equilibrium.

And, in that direction, there is evidence enough to conclude, recent communism points its shaking finger.

A Critical Note on Marxism

ARUNODAY BHATTACHARYYA

Fourth Year, Arts

The Communist Manifesto begins with the statement that "The history of all hitherto existing society is the history of class struggles." With this general premise about history as a whole, it proceeds to construct a theory of dynamic changes in the affairs of mankind and their organisational framework. It postulates that modern society is bifurcating more and more into two great hostile camps,—the bourgeoisie and the proletariat.

Assuming this proposition to be axiomatic, the first part of the Manifesto analyses the life-cycle of the bourgeois society. And this analysis is the outcome of Marx's Materialistic Conception of History. The fundamental tenet of the doctrine is that, economic factors would be found in the long run to determine all apparently political tendencies and the particular mode of production to shape the political form, and class-structure of each stage. From this standpoint, the outcome of the Industrial Revolution in the beginning of the nineteenth century was the division of English society into two classes. First, a small privileged class—the owners of the means of production; second, a large propertyless proletariat. Admittedly, there had been capitalists and workers—employers and employees even before the Revolution. But the outstanding feature of modern society is the pivotal position of the capitalists as a class. The State is organised, we are told, to give expression to their dominance. And, this results in a tussle between the capitalists and the proletariat on an economic plane. This hostile attitude, originating from irreconcilable economic motives culminates in a perpetual struggle which, in Marxian terminology, is "the class-war". Further, Marx says that as society changes and evolves, there comes the next phase. Capitalism will then take on a modified shape by the concentration of capital into fewer hands. At the same time, on the other hand, the dispossessed class will get consolidated. And in the ultimate stage, the proletariat will revolt, overthrow the bourgeoisie and dispossess them of the means of production. This overthrow, says Marx, is analogous to the ousting of the preceding privileged feudal class by the capitalists. And on the same thesis that political events are the reflection of the prevailing economic structure, the victory of the proletariat will give birth to a new social structure with no class discrimination. Without discussing the stability of the so-called classless society,—the illusive Marxian panacea of social ills,—and the desirability as well as the feasibility of ushering in an era, when "the state will

wither away",—it can be cogently pointed out that Marx overemphasised the role of economic factors in provoking a revolution. The analysis is full of so many loopholes and lacunae that pressed against the facts of history, the whole edifice crumbles down. Certainly the economic factor has its part, but can all revolutions and mass uprisings be termed offsprings of sheer economic causes?

The underlying ideas of Marx's hypothesis can be pointed out briefly. Marx affirms class-struggle to be the gist of human history. He maintains, secondly, that the state is essentially a class institution, expressing the will of the dominant bourgeois class. It is a political pyramid with the economic structure as its base: a base which corresponds to the stage in the development of the powers of production. In the next place, he characterises the expansive nature of capitalism which requires an expanding market to satisfy its ever increasing hunger. And as a corollary, the need for expanding markets "chases the bourgeoisie over the whole globe". Fourthly, Marx lays bare the "contradictions" involved in the failure of purchasing power in the developed industrial countries to consume the growing machine-products, which eventually leads to recurrent crises. The catastrophe, we are told, can be avoided only by ousting a large number of smaller capitalists—the poor victims in a Darwinian world of struggle for existence. And, consequently, this results in a vast destruction of productive instruments. Fifthly, he speaks of the necessary creation of the proletariat within the system of capitalist industry, and therewith the destruction through the increasing application of machinery of the varied skills of different types of labour, and the transformation of labour to a mere undifferentiated commodity. And, in the next step, as the skill is destroyed only to be replaced by inefficiency, Marx suggests that there grows a tendency for the working class to be dragged down more and more to uniform subsistence level. This tendency gains in momentum through the limitation of the market and the recurrent crisis of unemployment. Furthermore, he believes that this tendency is coupled with a second tendency for the middle class to be crushed out between the proletariat and capitalists through the increased concentration of capital, which flings more and more of them into the ranks of proletariat. Next, Marx holds up the key importance of the development of Trade-Unions among the proletariat. These are formed in the beginning on a narrow sectional basis, but thereafter increasingly on a class basis with a corresponding awakening of political consciousness. Ninthly, he recognises the service rendered to the proletariat by intellectuals and members of the ruling class who are either forced to line up with the proletariat or understand the nature of changing epochs of history and join hands with it. In the next place, Marx admits the national character of the struggle against the bourgeoisie, even though capitalism itself increasingly takes on a cosmopolitan colour. Eleventhly, he speaks of a contrast between the proletariat and all previous insurgent classes in that, whereas these previous classes developed their importance and

strength within the pre-existent social framework, the working class is goaded to revolt through its own growing impoverishment and misery. And lastly, Marx asserts the dependence of the bourgeois system both on the progressive accumulation of capital and on its periodical destruction by crises which tend to become continually more disastrous.

These postulates, no doubt, provide enough food for thought. But, while considering them, one must remember that the Communist Manifesto was written on the eve of the outbreak of the Revolution of 1848. Great Britain was then the most advanced capitalist country; but the Industrial Revolution did not bring increasing wealth to the labourers in the new mines and factories. The workers reacted to this situation through consolidated Trade-Unions. This had been steadily followed by the rise of the mass political movement of Chartism, which had all the symptoms of a hunger revolt. In this environment, it was not unnatural for Marx and Engels to think that there was a tendency for capitalist production to reduce wages to the rock-bottom of a common subsistence level and to oust small producers from business. Nor was it unnatural for them to suppose that the workers would organise a powerful political mass movement, the thrust of which would be too strong for the capitalists to resist. And they maintained that such a movement could not crystallise in Great Britain because there was no theoretical leadership to guide the working class to accomplish its historical mission. History bears out the fact and hence any comment would be redundant. But one feels tempted to say that had Marx deferred for another decade the writing of the Communist Manifesto, his inferences from contemporary political movements would have been different.

Marx, being in Great Britain after the collapse of the Revolution of 1848, had ample opportunities to observe the changes and to modify, had he so desired, the doctrines set forth in the Manifesto. But he never did so. He was, probably, aware that in Great Britain, the diagnosis of "increasing misery" accompanying increasing capitalist concentration was not being borne out by facts. Marx, however, thought that this could be explained in terms of her advanced economic techniques—her ability to capture all she wanted of an expanding world market. From this standpoint, the improved living standards of skilled workers may be attributed to their getting a share in the proceeds of world exploitation. These conditions were, nevertheless, considered by him to be temporary. On the other hand, in the continent of Europe, with its long lag behind Great Britain in capitalist progress, the diagnosis of 1848 still seemed to him to hold good, and there seemed no need to amend his doctrines. In short, Marx bolstered up, at all events, his general theory of capitalist concentration and increasing misery. But, as already pointed out, his analysis as related to British conditions no longer looked valid.

Marx in 1847 was wrong about the processes of class differentiation as capitalism developed and he greatly overestimated the effects of the "contradictions of capitalism" as manifested in current economic crises. He mistook

what was a passing phase in the development of modern industrialism for a continuous tendency calculated to result in the speedy overthrow of the entire capitalist system. And, as a matter of fact, that was one principal reason why Marxism in Western Europe underwent so profound a transformation in the hands of Marx's successors. But, strangely enough, the original pathology of 1847 was found to fit very much better the conditions in the less developed countries and especially in Russia which was then outside Marx's purview of capitalist countries.

It cannot, however, be denied that Marx's doctrine had a tremendous influence on working class thought. And, as a matter of fact, this has played a greater part than Marx's Theory of Value in making his name venerated as the Father of Socialism. But why does the theory attract the working class? The reason is not far to seek. It gives the working class the hope of winning the laurel of victory. Yet here, the thoughtful reader may pause and ponder. The Materialistic Interpretation of History states that the mere process of unfolding of history in accordance with the unalterable principles of social evolution,—whereby political changes follow and reflect economic changes,—will, in due course, lead to the dispossession of the capitalist class. If this be so, is there any need of the class-war or the rise of the proletariat? Is the process of evolution violent and abrupt? Or, can we not have recourse to slow and peaceful methods of bringing about the millennium? Bewildering answers to these queries have been given by intellectuals and they are classified into two schools of Socialism—the Evolutionary and the Revolutionary. A thoughtful reader would be critical and cautious in delivering judgment. And the present writer here proposes to do no more than to focus attention on the political movements and ideologies of the present-day world and to judge the validity of Marx's doctrines in explaining the political acts and ideals of the present century.

Has the "clarion-call" of Marx (or to be precise, of Marx and Engels) succeeded in uniting the workers of the world? Has the proletariat overthrown—or do modern political tendencies indicate that it will overthrow the capitalists in the way narrated in the Manifesto? Have Marx's prophecies come true? Indeed, it is patent in the present-day world that the monster of capitalism is slowly succumbing to the forces of decay. It is dying a lingering death. But its grave yard is not along the Marxian path.

In the modern world, progressive and developing countries have launched upon plans of building up welfare states—in most cases under democratic constitutions. This restores our faith in graduality. Workers and producers can be made to settle their disputes not by waging 'class-war' but by peaceful democratic means. The workers need not be daunted by any Frankenstein emerging from the fossil of unrestricted capitalism. Minimum Wage legislation, the Factory Act, Industrial Labour legislation and a host of legal devices are there to arm them against undue exploitation by capitalists. The State has assumed a vital rôle in every country. The ideal of *laissez-faire* is now a

fact of past history. Violent fluctuations in economic activity through the free play of the variables of income and employment are unlikely to recur. The tax and fiscal weapons in the hands of a modern State can arrest any such volatile fluctuations. Further, mixed economy has come to stay. We, in India, have a growing public sector. One imagines the ghost of Karl Marx shivering at these developments and at the futility of his doctrines.

In conclusion, Marxism in the present world stands discarded, dislodged if not dishonoured. Still, there are a few Marxists—perhaps haunted by the ghost of the nineteenth century bourgeois society—who are trying to preserve the crumbling edifice of Marxism from the rude shocks from reality. The lesson of history, unfortunately, is that dogmatism has never revived a dead creed.

An Eminent Victorian

PREMENDRANATH ADDY

Third Year, Arts

He was Gilbert to his friends, the “Old Man” to the public of his own times, to posterity he has endeared himself as “W. G.”. In appearance not unlike a major prophet out of the Old Testament, he was a bearded giant, flanneled and Victorian all through.

Grace was to cricket what Gladstone was to politics and Tennyson to poetry. Even more, through his skill he developed the basic principles of the game, through his personality he gave to it tradition and legend. When he entered the game, it was just village amusement; he left it as the national pastime of his country. From a mere abstraction he made cricket into a living growth. He welded forward-play and back-play into the modern technique of batsmanship; he demonstrated the art of placing a ball; also he was the living embodiment of Victorian Cricket. “He found”—as Ranji said with a high dash of poetry—“cricket a one-stringed fiddle and left it a many-stringed lyre.” Bracketed with Gladstone and Queen Victoria he formed the great Victorian triumvirate. An object of admiration and awe, he was an institution in himself. Crowds flocked to see his play, sometimes only to see him. And what a sense of occasion he had! He never disappointed his admirers if he could help it. Once, on being given out early to a doubtful decision, he calmly told the Umpire not to be silly but to carry on with the game since “these people”—and he pointed to the onlookers with a flourish of his bat—“have come to see me and not you”. Not always however did he get off with his retort militant. Once a very famous bowler, to an astonished W. G.’s discomfiture, knocked out both off and middle stumps with a perfect

delivery. As the great batsman slowly prepared for the long trudge back to the pavilion, the bowler cried after him, "Hi Doctor! There's still another strump standing." By way of reply, the doctor's great black beard bristled.

Amid players in the field he was by virtue of his skill and size a Jupiter among mortals. His bat he used to good purpose. It caused destruction all around. By mid-afternoon, ten fieldsmen were reduced to perspiring blocks of wood, and the bowler to an incarnation of Despair itself. There is indeed a matchless description of W. G. at his best. "W. G. Grace", a reporter wrote of him, "is a large-framed, loose-jointed man, and you would say that his gait was a trifle peculiar, but when he goes into the field you see that he is quick-sighted, sure-handed, and light-footed as the rest. He always goes in first, and to see him tap the ball gently to the off for one, draw it to the on for two, pound it to the limits for four, drive it, heaven knows where, for six, it all looks as easy as rolling off a log". In this particular game the sixer landed in a field of melons and in consequence took long to retrieve.

Those who saw W. G., willow in hand, on a lovely summer's day, treasured jealously the memory of that occasion. Years later they would probably babble about it around a chimney-corner to the younger generation sitting at their feet.

He was, lest it be forgotten, a great bowler too. That is why in an inscription placed beside a portrait in the National Portrait Gallery, the words—chosen wisely enough—were "The greatest of the World's cricketers; as a batsman supreme, as a bowler great". He was in fact a bowling favourite wherever he appeared, especially at Lords where, it is said, a hum of pleasure ran round the spectators when he put himself on to bowl. His action was classic to watch, and the cunning of his attack made onlookers laugh with sheer delight.

All in all, W. G. Grace was a mighty Victorian, an outstanding personality in the years before cheap journalism had made nearly all men indistinguishable. How definite are our impression of those eminent Victorians! Of Tennyson, with his cloak, his sombrero, his gruff laconics, of Gladstone's collar, Disraeli's forelock, Mathew Arnold's whiskers, Newman's ascetic frailty, or indeed of the satisfied look of many a pater familias, with a heavy watch chain adorning his considerable waist, as he sits in some old photograph surrounded by his trembling females, radiating confidence in progress and the future of the British middle class. To them add W. G., black bearded, resplendent in cream flannels and the M. C. C. cap and the picture is complete. His beard indeed was an essential part of him. It shared in his many triumphs and his lasting fame. Without it, he would be a lion shorn of its mane.

That then was W. G. Grace, maker and architect of England's national sport, and not even Lytton Strachey, with his devastating pen and his unceremonious manner, could have dethroned from his lofty pedestal this Eminent Victorian.

A Homily On Neighbours

ASHOK GUHA

Fifth Year, Arts

It is one of the strange facts of modern life that we, of the mid-twentieth century, should continue, in the hard clarity of the light of reason, to delight in mystery; but then, to repeat the old platitude, fact must ever be stranger than fiction. Whether this is due to our desire to recapture the vintage flavour of older days of shadows, which today have melted away in a flood of light, or whether it is part of the paradox of modern life itself, I am not, of course, prepared to say. Whatever may be the answer in this respect, we may fairly put down contemporary interest in neighbours to our curiosity as to skeletons in all cupboards. We conduct our archaeological researches in this direction with a relentlessness that few excavators could have known; and when we fail to unearth anything more objectionable about our neighbour than his moustache or his patronising manner, we nevertheless smile secretively, perhaps even indulge in a wink, and express our enlightenment in words to the effect that 'There are more things on heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.' What does it matter if it be a case of the Sphinx without a secret? We have enjoyed our share of mystery-making; and, for us, in this age, such things are.

Not to say, of course, that it is only today that one's neighbours have become a focus of mystery for the romantically-minded. The instinct for mystery we have always in us. And, it is to this eternal quality of man that we owe our age-old heritage of spicy scandal about the commercial traveller and the farmer's daughter. Ours, however, is the age of all-pervasive publicity. We live in the intermittent glare of flashlight cameras, in flats which offer unlimited opportunity for the eavesdropper. And the privacy of our neighbours is scarcely inviolate while we persist in collecting the material for our pipe full of daily gossip at holes in our separating walls. Thanks to the structure of the modern apartment-building, we are today in a position to proclaim to the world our neighbour's secret intentions of marriage, to trumpet forth from the house-tops the news of his designs upon the winsome widow next door: though, of course, we are rightly resentful if he reciprocates our attentions. Here, at last, is a field in which we have broken the monopoly of omniscience of all the little birds who whisper in the columns of our daily press; with regard to our neighbours, at least, any of us may justifiably boast

I am Sir Oracle, and when I ope my lips
Let no dog bark,

Unfortunately, the subject of our probes is rarely content with turning the other cheek. Make him—though we may—the butt of family fun, the stock-target of all our private parodies, we cannot yet afford to chuckle complacently to ourselves, after Rosalind, about ‘the dulness of the fool being the whetstone of wits.’ For the fool has a method in his madness. He seeks retaliation; he is bent on Shylock’s full pound of flesh, and is not in the least averse to imbuing his dogs with this very literal doctrine. But, if he incites his bloodthirsty poodles to numberless helpings off over heels, he inculcates in his own children habits which are even more obnoxious. Indeed, his offspring combine, for us, all that is worst in the Modern Child, that bundle of assorted vice that forms the motif of so much of our after-dinner eloquence.

As if this were not provocation enough, the neighbour chooses to heighten our hangovers with the nerve-racking clatter of his crockery. Our spells of indigestion find his kitchen reeking of delicacies forbidden us in our present state of health. He preens his wives and daughters in the height of fashion, stirring the females of our families to a frenzy of emulation.’ The result is, more often than not, a vicious spiral of sartorial competition, which, in an age of hard cash and high prices, spells certain bankruptcy.

The neighbour even appears to share Huxley’s perfectly unjustifiable faith in music at night. His radios shatter stridently the peace of our ‘tobacco-trances’; the midnight blare of his gramophones makes of our cherished eight hours one long bridge of sighs and yawns. And, what is more, his music is invariably of the most dubious brand. He adds to the cacaphony of rusty strings, Eliot’s disturbing ‘ariettes of cracked cornets’, and the least gifted of our bathroom-singers would blush at the brazen monotone of his efforts at song.

Indeed, even in a world of shady morals, the ethics of our neighbours are unflatteringly below par. After all, the machinations of Sir Gregory Parsloe of Matchingham against his neighbour, the Ninth Earl of Blandings, his unscrupulous efforts for the success of his own Queen of Matchingham in her historic contest with the Empress of Blandings for supremacy in the Shropshire Fat Pigs class are all part of modern mythology.

Yet, if the neighbour’s moral obtuseness is shocking, it is, at the same time, flattering to our self-esteem. We may now wear a proud air of conscious rectitude; we can justify our feeling of belonging to a superior and a select caste in a world of benighted philistines. And this self-assumed halo is, in itself, enough to deepen our sense of estrangement.

Hence it is that all the happy warrior in us rises up in everlasting crusade against the man next door. Here, we feel, is an opportunity no red-blooded man should neglect of satisfying his pugnacious instincts at no cost. One remembers—to revert to Woodhouse—that the tension between Sir Gregory and the Ninth Earl was not restricted to stock-rearing, that it would boil

over in nightly forays upon each other's gardens, that whenever the neighbours dined together there was always an ominous premonition of strychnine in the soup, and that the Hon. Galahad, the Earl's sprightly brother, sought to blacken Sir Gregory's reputation for temperance by reviving the forty-year-old story of the prawns. Indeed, so deeply ingrained is this crusading habit that we may fume at our neighbour in righteous wrath, invoke the blight on his potatoes, and the greenfly on his roses, and no questions asked, not an eyebrow raised; for such is the way of all flesh. We cannot, today, think even of our neighbours on Mars except in terms of a war of the worlds; for, in an age of space travel and baby moons, we have, projected our hostilities on to an inter-planetary plane.

All this, of course, does not imply that temporary *rapprochements* do not occasionally break in. One remembers Romeo and Juliet, the most celebrated in our gallery of Great Lovers through the Ages drawn from hostile neighbouring families. Here, however, one is tempted to assert that it is a case of distance lending an insubstantial enchantment to the view. Nothing, after all, is so potent in fostering adolescent gallantry as adult injunctions to keep clear of the squint-eyed siren next door: loving one's neighbour is never so delicious as when it savours of forbidden pleasure. Hence the upshot.

Yet such reconciliations are but passing episodes in a world where the dominant fact, in politics as in neighbourly relations, is the inevitable cold war. In this war, the weapons are barbed tongues or an icy speechlessness; no longer are they as innocuous or as innocent as the plum-stones that J. M. Barrie flung at Bernard Shaw's windows at Adelphi Terrace; indeed, it is sobering to reflect that Sir James might well have had to pay for his levity with the cost of the broken window-panes.

D. V. Paluskar

AMIYA KUMAR SEN

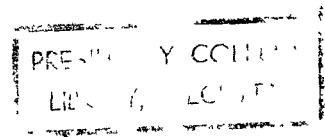
Ex-Student

Those whom the gods love—so it is said—die young. The death of Pandit Dattatreya Vishnu Paluskar took place at the premature age of thirty-five, and was an irreparable loss to the world of music. We all know that the art of the executant has only transitory value, that in its highest manifestations it can be no more than a perfect reflection of the far greater and far more permanent factor—the idea and thought as expressed by the *raga*. Nevertheless, to achieve this perfect reflection is of vital importance, for it constitutes the realisation of the supreme and divine thought and idea of the *raga* in terms of actual sound, which is the *raison d'etre*, indeed the very stuff, of the art of music.

Paluskar was one of the supreme artists of our time. He carried on in the royal line of Pandit Vishnu Digambar Paluskar, his father, and Pandit Vinayakrao N. Patwardhan, his teacher, and alone was fit, or almost fit, to meet them on equal terms, especially in the field of devotional songs. He possessed every requisite of the really great singer, tone, technique, musicianship, sensitiveness, taste, style and personality. Among singers, only a few have ever combined such intensity of expression and ease of execution with the unique quality of tone that distinguished Paluskar from all his contemporaries.

Pandit Dattatreya Vishnu Paluskar had the qualities of a saint. The spiritual goodness of his nature, his modesty, his gentleness, his firm purpose of will, his nobility and loftiness of thought and action communicated themselves to all who met him, and to the remotest listeners in the halls where he sang.

Paluskar was born at Karundwad, a small town near Kolhapur on May 21, 1921, and spent his early days at Nasik, where he received his primary school education. He was cradled in music. Bapuji, as Pandit Dattatreya Vishnu Paluskar was called by his intimate friends and relations, inherited the talents of his father, Pandit Vishnu Digambar Paluskar—a name still remembered with deepest respect and veneration in musical circles. Pandit Vishnu Digambar in turn received his music lessons from Pandit Balkrishna Buwa, who introduced the *Kheyal* style of the Gwalior *gharana* in Maharashtra. It was through this apostolic succession that Paluskar acquired that stylistic heritage which he brought to a perfection hitherto undreamt of. His father, Pandit Vishnu Digambar was himself a pioneer in the art of



singing devotional songs, many of which he studied during his tour of India in the early years of this century.

At the age of eight, Bapuji was initiated into the study of music by his father. But Bapuji was not destined to receive paternal guidance for long, because when his father died in 1931, he was only nine.

Bapuji's cousin and other senior disciples of Pandit Vishnu Digambar Paluskar nursed the last survivor of their revered Guru's twelve children and imparted further musical knowledge to him. Bapuji was able to study music at Gandharva Mahavidyala, Poona, which, at the time, was at the disposal of Pandit Vinayakrao N. Patwardhan, a leading disciple of Pandit Vishnu Digambar Paluskar. At Poona, Bapuji pursued his secondary school education (upto the matriculation standard) along with his musical education.

It was never in question that he should devote his life to music, but only later did circumstances dictate, as a consequence of his father's untimely death, that he should become a professional singer. So music became his preoccupation from infancy. His general education, therefore, was built mainly around his music. Throughout the early years of his life, for nearly fifteen years, this young boy toiled relentlessly to build up that incomparable technique and that magical voice with which we are all too familiar. He learnt the theory of music, first from his father's noted disciples, Pandit Vinayakrao Patwardhan and Pandit Narayanarao Vyas, and subsequently from some of the books written by his father before his untimely death.

Bapuji's first public appearance as a musician was in 1935 when he was invited to sing at the Jullunder Haraballabh Music Conference. Three years later, he made his debut over the Bombay station of the All India Radio on the occasion of the death anniversary of his father. His performances were very well received by music lovers and he was acclaimed as a singer of great promise.

In recognition of his mastery over music, the title of Sangeet Praveen was conferred on him in 1940 by the Gandharva Mahavidyalaya, Poona. The title of Sangeet Sumeru was also conferred on him in 1946 by the music-loving people of Benares.

Bapuji was devoted to his music and to his mother, who is still living, aged eighty. It was in deference to her wishes that he declined the invitation to tour the U.S.S.R. in 1954 as a member of a cultural delegation. Early in 1955, however, he visited the People's Republic of China as a member of the Indian Cultural Delegation.

Bapuji was a musician—a musician who used his voice as a means of communicating and expressing his personality. Only in terms of his qualities as a musician can one hope to explain, to understand or describe him.

He loved recording. As an incurable perfectionist, it delighted him, for he had so complete a control over his voice that he was by nature a very clean singer. Thus, with the aid of a gramophone, we may today have 'the touch of a vanished hand, and hear the sound of a voice that is still.'

Paluskar's sense of responsibility to the public came out of his reverence for music. Hard as he worked on purely technical problems of tone, sonority and articulation, he was not a 'virtuoso' in the word's modern and debased sense—though certainly in its seventeenth century application a 'connoisseur'. He never favoured display or brilliance of execution as ends in themselves, though he was almost overgenerous in his praise and admiration for his many contemporaries who have. Rather was his miraculous singing the result of a mastery of the physical-technical part of his art which was so complete that his mind and spirit were free to express themselves in music.

He was a musician who won the hearts of music lovers by sheer mastery of art and his bewitching style—a style whose origin can be traced back to the fifteenth century when the Gwalior style became prominent. A long period of time separates that age from the present, but there is little doubt that Pandit Dattatreya Vishnu Paluskar maintained his inheritance with supreme zeal and devotion. Musical circles will remember for ever his contributions to the art of singing *Kheyal* and *Bhajan*, in both of which he was the accredited leader of a rising group of musicians who consider neatness of form to be the most important factor in music. Into his devotional singing, he poured a lyrical intensity which made of the *bhajan* what it was meant to be—a consecration at the altar of the living God. He was not in favour of attaining great speed in *tans* and other embellishments of Indian classical music at the expense of detail—a defect which is manifest in the singing of many musicians. We all know how particular he was on this point. He was able simultaneously to sustain great speed and to achieve great clarity in his singing of *Kheyal*. His was no mere sweetness of the surfaces. Through the ripple of melodies, fluid as water, he was able, strangely enough, to suggest resonances of depth unsurpassed. Above all, he could create out of an evanescence of fleeting sounds a lasting impression which was his own rendering of the emotional value of the relevant *rag*—an ability as often as not denied to the purely melodic artist.

Paluskar, indeed, has bequeathed to the future a lasting and magical memory. He has, it is safe to predict, secured a permanent place in the tradition of Indian art—an attainment difficult enough in the realm of music, which, as Arthur Symonds has said, is 'the only absolutely disembodied art when it is heard, and no more than a proposition of Euclid when it is written.'¹

¹ Reproduced with necessary emendations from ISM (February 1956).

Book Review

TWENTYTHREE YEARS WEEP—Jiben Sidhanta. Published by Indranil Chattopadhyay, Calcutta. Pages 48. Rupees 1.50.

It has been claimed in the Publisher's note to Jiben Sidhanta's first book of poems that they have a certain uniqueness. The claim is a little preposterous and is therefore the last thing to pass unchallenged. For, in "23 years weep" we find the echoes of a number of wellknown lines. For example, while the opening verses of 'Dawn' recall the oftquoted lines of Donne, we can hardly miss the Shelleyan ring in "Midnight".

"This demented agony to inspiring light
So a light to eternity—"

Also his invocation to Sri Aurobindo is reminiscent of Wordsworth's magnificent apostrophe to Milton. There is no necessity of accumulating similar examples, for the poet candidly acknowledges his indebtedness to his predecessors in "When poetry Ceaseth."

"In Shelley's furrow I till the soil."

Nevertheless it has to be conceded that "23 years weep" has its purple patches—its moments of genuine poetry. Like his own idol Shelley, Mr. Sidhanta exhales verse, as flower exhales fragrance. And when this spontaneity is attended with a deep emotional fervour, we get lines like,

"Thine face be a beacon
Like pole star of hazardous seamen
Mine barge of life set sail
Thro' main of thine unfolding love."

The very name "23 Years Weep" need not scare away any of its readers. For, happily the poet is not wrapped up in any morbid self-consciousness or brooding melancholy. Occasionally there are tender undertones, of love, or wistful nostalgic longings of the soul expressed in verses which are marked by almost, a Keatsian lilt, *e.g.*,

"The dreambed that sticky feels by hopeless tears."

or

"To this drooping, spirit, embrace this wight
In love-lorn kiss"—

Sometimes Mr. Sidhanta succeeds in portraying unusual scenes of macabre suggestiveness and mention may be made of one in "Death",

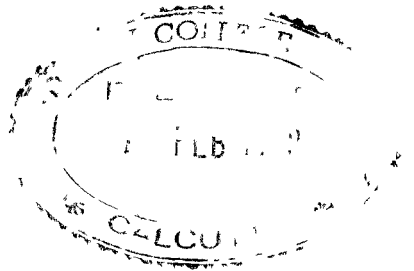
"One aged old moon shall rise
Here from the womb of mucky harbour."

The excellence of Mr. Sidhanta's form however is questionable. And much of it appears amateurish, when we consider his fond predilection for jingling verses. For example, the opening line of that devotional lyric,— "What Lila this thine O divine" completely mars the atmosphere. Secondly, his fondness for harsh sibilant sounds (or is it his incapacity to use right words?) often lends unnecessary reconditness and obscurity to his verses and makes them flat and prosaic *e.g.*,

"And lifting high the psychicising innateness
To a lofty pulpit of supra-sensory phase."

The getup of this small volume has been neat and tasteful. The printing is fairly good.

—K. S. R.



PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

- 1914-15. PRAMATHA NATH BANERJEE, B.A.
1915-16 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1916-17 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1917-18 SAROJ KUMAR DAS, B.A.
1918-19 AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1919-20 MAHMOOD HASAN, B.A.
1920-21 PHIROZE E. DASTOOR, B.A.
1921-22 SYAMA PRASAD MOOKLRJEE, B.A.
1921-22 BRAJAKANTA GUHA, B.A.
1922-23 UMA PRASAD MOOKERJEE
1923-24 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA
1924-25 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1925-26 ASIT KRISHNA MUKHERJEE, B.A.
1926-27 HUMAYUN Z. A. KABIR, B.A.
1927-28 HIRENDRA NATH MUKHERJEE, B.A.
1928-29 SUNIT KUMAR INDRA, B.A.
1929-30 TARAKNATH SEN, B.A.
1930-31 BHABATOSH DATTA, B.A.
1931-32 AJIT NATH ROY, B.A.
1932-33 SACHINDRA KUMAR MAJUMDAR, B.A.
1933-34 NIKHILNATH CHAKRAVARTY, B.A.
1934-35 ARDHENDU BAKSI, B.A.
1935-36 KALIDAS LAHIRI, B.A.
1936-37 ASOK MITRA, B.A.
1937-38 BIMAL CHANDRA SINHA, B.A.
1938-39 PRATAP CHANDRA SEN, B.A.
1938-39 NIRMAL CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1939-40 A. Q. M. MAHIUDDIN, B.A.
1940-41 MANILAL BANERJEE, B.A.
1941-42 ARUN BANERJEE, B.A.
1942-46 No publication due to Govt. Circular
Re. Paper Economy
1947-48 SUDHINDRANATH GUPTA, B.A.
1948-49 SUBIR KUMAR SEN, B.A.
1949-50 DILIP KUMAR KAR, B.A.
1950-51 KAMAL KUMAR GHATAK, B.A.
1951-52 SIPRA SARKAR, B.A.
1952-53 ARUN KUMAR DAS GUPTA, B.A.
1953-54 ASHIN RANJAN DAS GUPTA, B.A.
1954-55 SUKHAMOY CHAKRAVARTY, B.A.
1955-56 AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1956-57 ASOKE KUMAR CHATTERJEE, B.A.
1957-58 ASOKE SANJAY GUHA, B.A.
-

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

- 1914-15 JOGESH CHANDRA CHAKRAVARTI, B.A.
1915-16 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1916-17 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1917-18 RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A.
1918-19 MAHMOOD HASAN, B.A.
1919-20 PARAN CHANDRA GANGOOLI, B.A.
1920-21 SYAMA PRASAD MOOKERJEE
1921-22 BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA
1921-22 UMA PRASAD MOOKERJEE
1922-23 AKSHAY KUMAR SIRCAR
1923-24 BIMALA PRASAD MUKHERJEE
1924-25 BIJOY LAL LAHIRI
1926-27 LOKES CHANDRA GUHA ROY
1927-28 SUNIT KUMAR INDRA
1928-29 SYED MAHBUB MURSHED
1929-30 AJIT NATH ROY
1930-31 AJIT NATH ROY
1931-32 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1932-33 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1933-34 GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI
1934-35 SUDHIR KUMAR GHOSH
1935-36 PROVAT KUMAR SIRCAR
1936-37 ARUN KUMAR CHANDRA
1937-38 RAM CHANDRA MUKHERJEE
1938-39 ABU SAYEED CHOWDHURY
1939-40 BIMAL CHANDRA DATTA, B.A.
1940-41 PRABHAT PRASUN MODAK, B.A.
1941-42 GOLAM KARIM
1942-46 No publication due to Govt. Circular
Re. Paper Economy
- 1946-47 JIBANLAL DEV
1947-48 NIRMAL KUMAR SARKAR
1948-49 BANGENDU GANGOPADHYAY
1949-50 SOURINDRAMOHAN CHAKRAVARTY
1950-51 MANAS MUKUTMANI
1951-52 KALYAN KUMAR DAS GUPTA
1952-53 JYOTIRMOY PAL CHAUDHURI
1953-54 PRADIP KUMAR DAS.
1954-55 PRADIP RANJAN SARBADHIKARI
1955-56 DEVENDRA NATH BANNERJEE
1956-57 SUBAL DAS GUPTA
1957-58 DEBAKI NANDAN MONDOL
-

